

চেতনার অন্বেষণে

জুলাই সংখ্যা, ২০২২

বিস্মৃতির অন্তরালে: অক্ষয়কুমার দত্ত
মিথ বনাম বাস্তবতা: বিদ্যাসাগর
হেরোফিলোস ও ইরাসসিস্ট্রাস
ভারতীয় ইতিহাসের আরব্যকরণ এবং রাজনীতি

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

সূচি-

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের মাসিক পত্রিকা **'চেতনার অন্বেষণে'** জুলাই সংখ্যা, ২০২২।

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

সম্পাদকমণ্ডলী- **যুক্তিবাদীরা**।

যোগাযোগ:
ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com
টেলিগ্রাম- https://t.me/Yktibadira

মূল্য- ০০ টাকা
ওয়েবসাইট-
https://rationalists.wixsite.com/chetona

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ:

কবিতা:

সম্পাদকীয়

জুলাই সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে মনে হল দায়িত্ব অনেক বেড়েছে, কারন গ্রাহক সংখ্যা হঠাৎ করেই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র বিগত পনেরো দিনে সাতশজনের অধিক গ্রাহক ম্যাগাজিন পেতে চান জানিয়েছেন। এটা আমাদের কাছে আনন্দের।

মুক্তচিন্তার ওপর লেখালেখি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দেখে পত্রিকাটি শুরু করেছিলাম, এবং সেই লক্ষ্য এখনও স্থির রেখেছি। আপনারা যারা মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতার চর্চা করেন তারা যেমন পারবেন, যতটুকু পারবেন লিখুন। আপনার লেখনি চলুক এটুকুই চাই। ফেসবুক, ব্লগ ইত্যাদি মিডিয়ায় লেখাটি প্রকাশ করার পাশাপাশি আমাদের লেখাটি পাঠান। এমন নয় যে আপনার লেখাটি ফেসবুক বা কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে দেওয়া যাবে না, তা একেবারেই নয়। ক্রমশ রাজনৈতিক দিনগুলিতে যুক্তিবাদীরা কোনঠাসা হচ্ছে তাদের নিজেদের জন্য হলেও কলম তুলে নিতে হবে এটাই নির্মম সত্য। কোন লেখা প্রকাশ করতে গিয়ে নাম গোপন রাখতে চাইলেও অসুবিধা নেই ।

এই জুলাই মাসে বাংলায় যুক্তিবাদী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রজ অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মদিন, তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। আরোও এক বিশিষ্ট পুরোধাকে স্মরণ করি তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়। ধন্যবাদ সবাইকে ও যুক্তিবাদী শুভেচ্ছা।
পুনশ্চঃ লিখুন, আর লেখা পাঠান। ওই আগের ঠিকানাতেই yuktibadira@gmail.com

পত্রিকার এখন গ্রাহক সংখ্যা ৩০০০ ছাড়িয়েছে। বন্ধুদের উৎসাহিত করুন এবং আপনিও গ্রাহক হোন নিম্নের লিংকে ফ্রমটি ফিলাপ করে অথবা QR কোডটি স্ক্যান করে-
https://forms.gle/m3Y7BMG6RFjDhZAU8

'ঈশ্বরের' নিবাস বাংলার অন্যতম তীর্থস্থান

- সুদিন চট্টোপাধ্যায়

মধ্য কলকাতায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিজস্ব বাসভবন।

বিদ্যাসাগর প্রথম জীবনে নিজে কোনও বাড়ি না তৈরি করলেও শেষ বয়সে তাঁর বিপুল গ্রন্থসম্ভার রাখার জন্যেই ১৮৭৬ সালে মধ্য কলকাতার ২৫ বৃন্দাবন মল্লিক লেনে (এখনকার ঠিকানা ৩৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট) এক টুকরো জমি কিনে একটি দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। জীবনের শেষ চোদ্দ বছর তিনি কাটিয়েছেন এই বাড়িতেই। এই বাড়িতেই 'সাগর দর্শন' করতে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বহু জ্ঞাণীগুণী মানুষের নিত্য যাতায়াত ছিল এই বাড়িটিতে। রাত দুটো আঠারো মিনিটে, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে জুলাই, বঙ্গাব্দ ১২৯৮ সনের ১৩ ই শ্রাবণ এখানেই জীবনাবসান হয় বিদ্যাসাগরের। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'বিদ্যাসাগর এস্টেট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠিত হলেও তা এক সময়ে দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়ে। সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের মহামূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ লালগোলার মহারাজ নিলামে কিনে নেন। এই বাড়ি থেকেই বিদ্যাসাগরের সযত্ন সঞ্চিত গ্রন্থরাজি বাক্সবন্দি হয়ে চলে যায়। পরে অবশ্য বইগুলোর অধিকাংশই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ফিরে এসেছে। অল্প কিছু বই বিদ্যাসাগর কলেজে রয়েছে। গ্রন্থ সংগ্রহ রক্ষা পেলেও, বিদ্যাসাগরের ওই বাসভবনটি কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ক্রমেই জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং এক সময়ে সেটি দুষ্কৃতীদের আড্ডায় পরিণত হয়। দীর্ঘ কাল ওই অবস্থায় থাকার পরে পশ্চিম বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার আইনের লড়াইয়ে জয়ী হয়ে বাড়িটি দখলে আনেন এবং সংরক্ষিত ঘোষণা করেন।বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িগুলির মধ্যে একমাত্র রক্ষা পেয়েছে এই বাড়িটিই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইচ্ছানুসারে, বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাসাগরের এই বসত বাড়িটিতে নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নের নানা প্রকল্প চালু হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি ও পোড়ামাটির কাজে সাজানো একটি মুক্ত মঞ্চও তৈরি হয়েছিল। আন্তরিকতার সঙ্গে বিদ্যাসাগর জন্মবার্ষিকী পালন করতো কলেজের ছাত্রীরা। বর্তমান সরকার এসব স্থগিত করে ভবনটি সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন, সুসজ্জিত স্মৃতি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। জানি না সে কাজ কতদূর এগিয়েছে। আজ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণবার্ষিকী [২৯ জুলাই ১৮৯১], জানি না এ ভবন-দ্বার আজকের দিনে সর্বসাধারণের জন্যে অবারিত কিনা? গৃহটি এখন "ঐতিহ্য ভবন" হিসেবে চিহ্নিত।



একদা, 'ঈশ্বরের' নিবাস, বাংলার অন্যতম তীর্থস্থান।

"যে বুদ্ধিজীবী নিজের সময় ও সমাজ নিয়ে সন্তুষ্ট, সে গৃহপালিত পশু"

-হুমায়ুন আজাদ

বাংলায় বিজ্ঞান অক্ষয়

-সমুদ্র সেনগুপ্ত

বিদ্যাসাগর তাঁর লেখা "জীবনচরিত" বইটার পরিশিষ্ট অংশে "দুরুহ ও সঙ্কলিত নুতন শব্দের অর্থ" শিরোনামে একটি তালিকা দিলেন। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যেমন আছে, তেমনই অন্যান্য শব্দও আছে। দু চারটে নমুনা পেশ করা যাক। Botany (উদ্ভিদবিদ্যা), Optics (দৃষ্টিবিজ্ঞান), Telescope (দূরবীক্ষণ), Satelite (পারিপার্শ্বিক, উপগ্রহ) ইত্যাদি। একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, বঙ্কিম কথিত "টেক্সট বুক রাইটার" বিদ্যাসাগর মশাই কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় বিজ্ঞান পাঠ প্রচারের জন্য এসব লেখেন নি, তার মূল লক্ষ্য কিন্তু সেই শিশু শিক্ষা। [সূত্র: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী]

অক্ষয়কুমার দত্ত (যিনি ইংরেজিতে নিজের নাম লিখতেন Ukkhoy Coomar Dutt)-কে নিয়ে লিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের নাম টেনে আনার কারণ হল ওনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার। "পদার্থবিদ্যা: জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম" বলে যে বইটি উনি লিখলেন শকাব্দ ১৭৭৮ সালে সেই বইয়ের মুখবন্ধে (বিজ্ঞাপন) উনি লিখছেন, "এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার সময়ে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অমৃতলাল মিত্র মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্বক দেখিয়া দিয়াছেন।"

অক্ষয়কুমারের ভাষার ওপর বিদ্যাসাগরের প্রভাব সম্পর্কে যে জনশ্রুতি চালু আছে সেটি খন্ডন করতে গিয়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "অক্ষয় দত্তের বাংলা রচনাতে ঈশ্বর গুপ্তর নিকট হাতে খড়ি হয়। তবে অক্ষয় দত্ত যে বরাবর গুরুর রচনা পদ্ধতি নকল করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি খানিকটা বিদ্যাসাগরি রীতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া বিদ্যাসাগরের ও মাছি মারা গোছের নকল করেন নাই। অক্ষয় দত্ত যে রূপ প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন, তিনি যে কাহারও নকলে চলিবেন, ইহা কোনোমতেই সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার রচনায় ঔদার্য, অকপট আন্তরিকতা এবং মনের ভাব অকাতরে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালার অতি অল্প লেখকই প্রদর্শন করিয়াছেন" [সূত্র: পুরাতন প্রসঙ্গ]।

পদার্থবিদ্যা প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ইংরেজি ভাষায় রচিত বিভিন্ন বই অবলম্বনে রচিত এই পুস্তিকাটি লেখার সময় অক্ষয় কুমার সেকালের রীতি অনুযায়ী সাধুভাষাতেই লিখলেন কিন্তু তাতে বামুনের ঘরের চাল কাঁচকলা সৈন্ধব লবণের গন্ধ প্রায় নেই বললেই চলে। একটু খানি পড়া যাক, "জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে, কোন দ্রব্য নষ্ট হয় না, তাহার নাম অনশ্বরত্ব। সকল বস্তুকেই পুনঃ পুনঃ বিভাগ করিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার কনামাত্রও কোন ক্রমে ধংস হয় না। জল, পারদ প্রভৃতি বস্তু বাষ্প হইয়া আমাদের অদৃশ্য হয় কিন্তু তাহার অণুমাত্রও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। বাষ্প, জল ও বরফ এ তিনই এক পদার্থ; বরফ দ্রব হইয়া জল হয়, এবং জল উষ্ণ হইয়া বাষ্প হয়। বরফে যতগুলি পরমাণু থাকে, তাহা বাষ্প রূপে পরিণত হইলে,সে বাষ্পে ও ততগুলি থাকে, তাহার একটি পরমাণুর ও ধ্বংস হয় না।"

আজ যদি আমরা লিখতে বসি, তাহলে এই অনুচ্ছেদের ক্রিয়াপদগুলোকে চলিত ভাষায় আর বড়জোর ওই "দ্রব" শব্দটা কে গলে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কিছু পাল্টাতে পারবো না, এতটাই ঝরঝরে ছিল অক্ষয়কুমারের ভাষা, এতটাই আধুনিক। মলিকিউল আর এটম এর পরিভাষা হিসেবে অনায়াসে অণু আর পরমাণু ব্যবহার করছেন উনি। বইয়ের অন্যত্র স্বর্ণ, রৌপ্য লিখলেও প্লাটিনামকে "প্লাটিনম" লিখছেন, কোনো উদ্ভট অপ্রচলিত পরিভাষা ব্যবহার করেন নি।

পরিভাষা নিয়ে তাঁর এই অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখছেন, "স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লিখিবার চেষ্টা হইতেছে। এ বিষয়ে উক্ত মহাত্মাদ্বয়ই প্রথম পথপ্রদর্শক।" [সূত্র: শক্তিব্রত ভৌমিক সম্পাদিত: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন]।

ওই প্ল্যাটিনম এ একটিবার ফেরত আসা যাক। এবিষয়ে দত্ত মশাই এর উত্তরসুরি রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "বারবার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দ বিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে উঠে, মুলে যেটা অসঙ্গত, অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে" [সূত্র: মানস প্রতিম দাস: বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা ও অক্ষয় কুমার দত্ত]। রাজশেখর বসুও এই কৃত্রিম পরিভাষা আমদানির বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর মত অনুযায়ী অক্সিজেন এর বদলে অম্লজান লিখলে ভাষা মোটেও পুষ্ট হবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪)দের ধারা ধরে দুঃখিনী বাংলা মায়ের বাংলা ভাষায় আমরা যারাই একটু আধটু বিজ্ঞান চর্চার চেষ্টা করি তাদের কাছে আজকের দিনটা'র

একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ পিউরিট্যান ছিলেন, মদ্যপানের বিরুদ্ধে ও আমিষ ভক্ষণের বিরুদ্ধে লিখে গেছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় ওনার অবদান সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।
বিশেষ জ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রেখে, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে একটা জাতির কোনোদিন উন্নতি হতে পারে না, তাকে সর্ব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হলে মাতৃ ভাষায় চর্চা করতে হবেই। লিখতে বসে পরিভাষা খুঁজতে গিয়ে যখন বিরক্তি আসে, মনে হয় ধুত্তর এত খেটে কি হবে, ইংরেজি/ল্যাটিন/গ্রীক শব্দগুলো বাংলা হরফে লিখে দিলেই তো গোল মিটে যায় তখনই দত্তকুলোদ্ভব এই মেধাবী মানুষটি যিনি সারাটা জীবন মস্তিকের চর্চা করলেন, দুঃখজনকভাবে শেষ বয়সে যিনি সেই মস্তিষ্কের অসুখেই আক্রান্ত হয়ে পড়েন, নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন, আশেপাশের লোক তাঁকে পাগল বলে আখ্যা দিল, সেই মানুষটার নাম স্মরণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ি। অন্যেরা দেখে, হাসে আর বলে, "যতসব পাগলের কান্ড"।
অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে, বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা করতে গিয়ে আসুন, সব পাগল আমরা আজ ওঁর জন্মদিনে একজোট হই।

অক্ষয় কুমার দত্ত উপাসনা বা প্রার্থনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। একবার কলকাতার হিন্দু হস্টেলের কিছু ছাত্র তাঁকে প্রার্থনার সাপেক্ষে প্রশ্ন করে। অক্ষয়কুমার তাদের পাল্টা প্রশ্ন করেন--- কৃষক পরিশ্রম করে কি পায়? তারা সমস্বরে বলে ওঠে-- 'শস্য'। এবার তিনি ছাত্রদের প্রশ্ন করেন-- কৃষক পরিশ্রমের সঙ্গে যদি প্রার্থনা করে, তাহলে কি পাবে? তারা একসঙ্গে বলে ওঠে-- 'শস্য'। তখন তিনি তাঁদের তারা বললো- 'না'। অক্ষরকুমার দত্ত বলে ওঠলেন-- তাহলে প্রার্থনার মূল্য দাঁড়ালো – শূন্য।
জিজ্ঞাসা করেন-- কৃষক এই যে প্রার্থনা করলো, তার জন্য বাড়তি কিছু পেলো কি?
তখন তিনি গনিতের সমীকরণ দিয়ে ছাত্রদের দেখালেন----
পরিশ্রম = শস্য।
প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য। অতএব প্রার্থনা = শূন্য।

বিস্মৃতির অন্তরালে: অক্ষয়কুমার দত্ত

-পার্থ সারথি চন্দ্র

গভীর রাত। এক তিনতলা বাড়ির ছাদে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছে। তবে তা নিচু গলায়। স্বামী ভদ্রলোকটির কণ্ঠ উচ্চকিত নয়। যুবকটির 'অপরাধ', তিনি স্ত্রীর প্রতি মনোযোগী নন। এই গভীর রাতে বাড়ির ছাদে বসে তিনি এক 'খগোল' যন্ত্র নিয়ে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁর প্রাণের বিষয়। আকাশ জুড়ে সারা রাত যে মহাজাগতিক বিস্ময়ের ঘটনা চলতে থাকে, সে সবের সাক্ষী থাকতে হলে যে রাত ছাড়া উপায় নেই! বিরক্ত, ক্ষুব্ধ স্ত্রী ছাদে উঠে এসেছেন আজ। এমন লোক কে দেখেছে, যে দুই প্রহর-আড়াই প্রহর রাতে স্ত্রীর শয্যা ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে! এ তো সামান্য বিড়ম্বনা নয়! উত্তরে যুবকটি শান্ত কণ্ঠে বললেন, "এমন লোকের স্ত্রী এরূপ কথা বলে, তা যে আরও বড় বিড়ম্বনার।"

খগোল-যন্ত্র হল 'দূরবিন'। পারিভাষিক শব্দ 'দূরবীক্ষণ'। এই নামটি দিয়েছেন রাত-জাগা ওই যুবক - অক্ষয়কুমার দত্ত। বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোলের ক্ষেত্রে আরও অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ তৈরি করেছিলেন তিনি। যেমন, অণুবীক্ষণ, চুম্বক, জ্যোতির্বিদ্যা, দাহ্য পদার্থ, জড়, তড়িৎ, পরিমিতি, ধ্রুবতারা, অঙ্গার, বাষ্প, বজ্র, জোয়ার, রামধনু, সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষণ, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, মানমন্দির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি। এগুলি নমুনা মাত্র। তালিকাটি দীর্ঘ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে পথ দেখিয়েছিল এই পরিভাষা।

আধুনিককালের প্রগতি ভাবনা সম্পর্কে আমাদের সবারই কমবেশি ধারণা রয়েছে। কাজেই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। রাজা রামমোহন রায়ই ঊনিশ শতকের গোড়ায় গোটা ভারতে নতুন যুগের প্রবর্তক, প্রথম প্রগতিবাদী মানুষ। তার ব্যক্তিত্ব ও বৈষয়িক জীবনে নানা অসংগতি থাকলেও বিদ্যায়-বিত্তে-জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় তিনি তাঁর সমকালের প্রথম সারির যে কোনো প্রাগ্রসর চিন্তাসম্পন্ন ইউরোপীয় নাগরিকের সমকক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে নবযুগের উদ্গাতা, দূরদর্শী ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাবিদ। প্রগতিশীল যুক্তিবাদের আরও প্রসার ঘটে লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রভাবে ও প্রচারে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে। শাস্ত্রিক সামাজিক লৌকিক বিধাসসংস্কার থেকে মুক্তি ছিল তাদের জীবনে নবলব্ধ যুক্তিবাদের অবদান। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রগতিশীলতা আমরা খুব একটা স্বীকার করি না বটে, কিন্তু তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন যে, সাহিত্য বিনোদনের বস্তু নয়, জাতীয় জীবনবিকাশের ভিত্তি ও অবলম্বনও। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুক্তিনির্ভর জ্ঞানমনস্কতা, যা তাঁর প্রগতিশীলতার এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনারই উজ্জ্বল নিদর্শন। বিদ্যাসাগরেরই সমবয়সী অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন আর একজন জিজ্ঞাসুদ্রোহী।

অক্ষয়কুমার দত্ত একাধারে গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক, বাংলা গদ্যের রূপকার, দার্শনিক, ফলিত বিজ্ঞান গবেষক, বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক, ধর্মীয় ছুঁতমার্গহীন মানুষ। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপাসক,তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বুদ্ধিমান মানুষ। সমকালীন বিশ্ব মানসিকতা তাঁর মধ্যে সংকলিত হয়েছিল। অগস্ত্যত কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ ও মানবতার আদর্শ, বেন্থাম-মিলের হিতবাদ বা উপযোগাত্মকতা, এমনকি হারবার্ট স্পেন্সারের সংশয় বা অজ্ঞেয়তা পর্যন্ত তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কঠোর নীতি পরায়ণ, বিনয়ী এবং দরিদ্রের প্রতি দয়াশীল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থই বলেছেন, "তিনিই বাঙালির সর্বপ্রথম নীতি শিক্ষক।" মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণার কেন্দ্র রূপে তাঁর অকৃত্রিম দানেই গড়ে উঠেছিল আজকের 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স'। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক সংযোগ। তাঁর শয়নশিখরে থাকত ডারউইন ও নিউটনের প্রতিকৃতি, ঘরের দেওয়ালে থাকত জ্যোতিষ্ক-লেখা গগনপট, নরকঙ্কাল, এবং পশুপঞ্জর (জাস্টিস সদাচরণ মিত্রের ভাদ্র ১৩১২ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে প্রদত্ত বিবরণ)।

বর্ধমান জেলায় নবদ্বীপের কাছে চুপী গ্রামে ১৮২০ সালের ১৫ জুলাই জন্মেছিলেন অক্ষয়কুমার। পিতা পীতাম্বর দত্ত এবং মাতা দয়াময়ী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র অক্ষয়কুমার। তাঁর পিতা কোলকাতায় পুলিশে চাকরি করতেন। গ্রামের স্কুলে কিছুদিন পড়ার পর তিনি কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়তে আসেন। কয়েক বছর পড়াশোনা করার পর পিতার মৃত্যু হলে তাঁকে লেখাপড়া

ছেড়ে দিতে হয়। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এত দূর পর্যন্তই। পিতার মৃত্যুর পর দারিদ্র্য-দশার ভিতর প্রতিপালিত হয়েছেন। এরপর তিনি অর্থোপার্জনে উদ্যোগী হন। কিন্তু পাশাপাশি অদম্য ছিল তাঁর জ্ঞানস্পৃহা। তাই বাড়িতেই নিজ উদ্যোগে পড়াশোনা চালিয়ে যান। স্কুলের ইংরেজ শিক্ষক বহুভাষাবিদ পণ্ডিত জেফ্রয়ের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর কাছে গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসি ও হিব্রু ভাষা ছাড়াও শেখেন পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, সাধারণ বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি। আর আমিরউদ্দীন মুন্সির কাছে শেখেন ফারসি ও আরবি ভাষা। পরবর্তীকালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক থাকার সময় কিছুদিন তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে গিয়ে অতিরিক্ত ছাত্র হিসেবে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও প্রকৃতিবিজ্ঞান পড়েছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' গঠন করলে তিনি তার সভ্য হন এবং ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মাসিক আট টাকা বেতনে ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় পাঠদানের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বাংলায় এসব বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক না থাকায় তিনি ১৮৪১ সালে 'ভূগোল' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১। তখনও বিদ্যাসাগরের কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থটি অক্ষয় দত্তের প্রথম গদ্যগ্রন্থ হলেও তাঁর ভাষা পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের তুলনায় অনেক প্রাঞ্জল ও সরল। এই গ্রন্থে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় যতি চিহ্ন ব্যবহার করেন। এই সেই ভাষার নমুনা: 'পৃথিবীর আকৃতি প্রায় গোল যেমন কমলালেবু গোলাকার। অথচ তাহার বোঁটার নিকট কিঞ্চিৎ নিম্ন, সেইরূপ পৃথিবীও গোল কিন্তু উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা।'

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। আগস্ট ১৬, ১৮৪৩ তারিখে তাঁর সম্পাদনায় ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। রচনাসম্ভারে ও পরিচালনার গুণে পত্রিকাটি শ্রেষ্ঠ বাংলা সাময়িকপত্রে পরিণত হয়। যদিও পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্ত ও তাঁর বন্ধু বিদ্যাসাগরের কারণে এটি সে সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস ও সমাজ সংস্কার, বিষয়ে একটি অগ্রণী পত্রিকায় পরিণত হয়। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও হিন্দু-বিধবাদের বিবাহের সমর্থনে এবং বাল্যবিবাহ ও বিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবহুল বলিষ্ঠ লেখাও এতে প্রকাশিত হত। সচিত্র প্রবন্ধও থাকত। নীলকর সাহেব ও জমিদারদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি এই পত্রিকায় নির্ভীকভাবে লেখনী চালনা করেন। দীর্ঘ বারো বছর তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

হিন্দু বিধবাবিবাহকে তিনি কতটুকু সমর্থন করতেন, 'ছন্দের জাদুকর' পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার অক্ষয় দত্তের এক কর্মচারী কয়েক হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যান। তাঁকে চিঠি লিখে জেল-পুলিশের ভয় দেখালে তিনি জবাবে তাঁকে জানান, 'আপনি আমাকে বলেছিলেন আমি বিধবাবিবাহ করলে আমাকে পুরস্কার দেবেন। আমি বিধবাবিবাহ করেছি।' অক্ষয়কুমার খোঁজ নিয়ে জানলেন, সত্যিই তিনি একজন বিধবাকেই বিয়ে করেছেন। তিনি সেই কর্মচারীকে চিঠি লিখলেন, 'তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করলাম'।'

'ভূগোল' প্রকাশের পনেরো বছর পর প্রকাশিত তাঁর 'পদার্থবিদ্যা' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের বই। এ ছাড়া বিজ্ঞানের ও সাধারণ জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা 'চারুপাঠ' (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) পাঠ্যপুস্তক হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছিল। এসব গ্রন্থে তিনি বিজ্ঞান ও ভূগোলের অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ তৈরি করেছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ, আহ্নিক গতি, বিষুব রেখা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, চুম্বক, বিকিরণ, তড়িৎ, সুমেরু, কুমেরু, স্থিতিস্থাপকতা, আপেক্ষিক গতি, ভারকেন্দ্র, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, জ্যোতির্বিদ্যা, দাহ্য পদার্থ, পরিমিতি, জড়, জোয়ার, রামধনু, ধ্রুবতারা, গ্রহণ, অঙ্গার, বাষ্প, বজ্র, সৌরজগত, মানমন্দির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি অসংখ্য পরিভাষা আজ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে এবং আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছি। বাংলা ভাষা নির্মাণে ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনে অক্ষয় দত্তের যে অবদান, তার গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর কীর্তির অলক্ষ্য প্রভাব আমাদের ওপর এখনও বহমান।

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অপর ২১ জন বন্ধুর সঙ্গে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য এই দলই প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্ম। অক্ষয়কুমার তেইশ বছর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীন চিন্তা ও নিবিড় বিজ্ঞানচর্চার কারণে এই সমাজবিজ্ঞানী সব ধরনের ভাববাদিতা ও সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন। যাত্রার 'শুভ-অশুভ' ক্ষণ বলে কিছু যে নেই তা প্রমাণ করার জন্য শাস্ত্রে 'অশুভ' এমন দিনক্ষণ দেখে তিনি ভ্রমণে বেরোতেন। অক্ষয় দত্তও হিন্দু ও ব্রাহ্মদের নিকট ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত বেদকে মানুষের রচনা এবং সে কারণে অভ্রান্ত নয় বলে ঘোষণা করেন। ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় ঈশ্বরোপাসনার তিনি অন্যতম প্রবর্তক। পরে তিনি প্রার্থনাদির প্রয়োজন স্বীকার করতেন না এবং শেষ বয়সে অনেকটা অজ্ঞাবাদী হয়ে পড়েন। ধর্ম–সম্পর্কিত এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'তে কাজ করা অক্ষয় দত্তের জন্য অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য, প্রচলিত পথের বাইরে হাঁটার জন্য তৎকালীন সমাজপতিরা তাঁকে একঘরে করার চেষ্টা করেন ও কিছুক্ষেত্রে সফলও হন।

হিন্দু হোস্টেলের এক দল ছাত্র অক্ষরকুমারকে ঈশ্বর-প্রার্থনার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন করল। তিনি বীজগণিতের সমীকরণ দিয়ে দেখালেন: পরিশ্রম=শস্য। পরিশ্রম+প্রার্থনা=শস্য। অতএব, প্রার্থনা=শূন্য। ছাত্ররা এই উপস্থাপনার নাটকীয়তায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের মুখে মুখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এই সমীকরণ। শিক্ষিত মহলেও আলোড়ন উঠল। এই ঘটনার দু'দিন পর মেডিকেল কলেজের 'ডিমনস্ট্রেটর' বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের দেখা, নীলমাধববাবু হাসতে হাসতে বলিলেন, "আপনি ভাল এক সমীকরণ দিয়া শহরটা তোলপাড় করিয়া দিয়াছেন।"

অক্ষয়কুমারের একটি বইয়ের জন্য স্কুলে আগুন লাগাতে চেয়েছিল কিছু লোক। ঢাকার বিক্রমপুরের ঘটনা। ১৮৫১ সাল। সদ্য বেরিয়েছে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' বইটি। বিক্রমপুরের কালীপাড়া স্কুলের এক দল ছাত্র বই পড়ে মুগ্ধ। দেড়শো বছরেরও আগে সেই বইয়ে অক্ষয়কুমার লিখছেন: "বিবাহের আগে হবু দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে ভাল ভাবে আলাপ-পরিচয় করে নেবে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য যেন বেশি না থাকে। সংসারে নারী ও পুরুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমান। যদি স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং সমাধানের কোনও পথ খুঁজে না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ কাম্য।"

তোলপাড় পড়ে গেল সর্বত্র। কালীপাড়া স্কুলের কিছু ছাত্র সভা করে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেন: 'আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়মসকল অবলম্বন করিব।' ধর্মান্ধ রক্ষণশীল মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিল। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, স্কুলবাড়িটাই পুড়িয়ে দেবেন। তবে এই হুমকিতে অগ্রণী ছাত্রদের প্রতিহত করা যায়নি। অনেকেই গৃহত্যাগী হয়েছিলেন সে দিন। অক্ষয়-জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন: "উপস্থিত বৃত্তান্তটি সঞ্জীবনী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন।" দ্বারকানাথের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা কুলীন ছিলেন, পরিবারে প্রায় সবাই বংশানুক্রমে চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে বিবাহ করতেন। দ্বারকানাথ পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে জানিয়েছিলেন, "আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।"

অক্ষয় দত্তের শিক্ষাচিন্তার আধুনিকতা এবং আজকের প্রাসঙ্গিকতা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। এখন আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মুখস্থনির্ভরতা থেকে মুক্ত করা নিয়ে চিন্তিত। দেড়শ বছর আগে অক্ষয় দত্ত কী বলেছিলেন, 'কালেজ ও স্কুলে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কেবল স্মরণশক্তি উন্নতিসাধনপক্ষে বিশেষ অনুকূল, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও উন্নতিসাধনের পক্ষে তত অনুকূল নহে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রধান প্রধান কালেজের অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে কোনো প্রশ্ন করেন না। কেবল গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া যান, ছাত্রেরা কেবল নোট লয়। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির কীরূপ পরিচালনা হইতে পারে, পাঠকবর্গ তাহা সহজে বুঝিতে পারেন।'

তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞানচর্চা সুগম হবে মাতৃভাষায়। সাবলীল হবে অভ্যাস। উনিশ শতকে অক্ষয়কুমার দত্তের হাত ধরেই বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত। এমনকি বাংলাভাষাকে তিনি বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী, দর্শনচর্চার এতটা উপযোগী করেছিলেন যে অনেক সময় মনে হয় বিদ্যাসাগরের চেয়েও তিনি কয়েক কদম এগিয়ে ছিলেন। পাশ্চাত্যী বেকনীয় দর্শনের অন্যতম গুণগ্রাহী

অক্ষয়কুমার দত্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রসারে তিনি যে গুরুত্ব দিতেন, তা অতুলনীয়। তিনিই প্রথম অফিস-আদালত ও উচ্চশিক্ষাসহ সব স্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের কথা বলেছিলেন। প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর তিনি প্রথা ভেঙে বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত বিশেষ করে আমাদের যে ঐতিহ্য সেটা নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন সবটাই আমাদের ধর্মের ঐতিহ্য নয়। আমাদের দেশে যুক্তিবাদের ঐতিহ্য ছিল, নিরীশ্বরবাদের ঐতিহ্য ছিল। যেটাকে আমরা হিন্দু ঐতিহ্য বলছি তারমধ্যেই একটা বড়ো অংশ অনিশ্বরবাদ নিয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন সাংখ্য দর্শন, মীমাংসা দর্শন যেগুলি খোলাখুলি ঈশ্বরবিরোধী ছিল।

'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদনার অমানুষিক শ্রম থেকে অব্যাহতি নিয়ে বিদ্যাসাগরের অনুরোধে নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিলেন। একটা মাস-মাইনে তো প্রয়োজন। কিন্তু এই কাজটাও করতে পারলেন না। বছর না ঘুরতে ছেড়ে দিলেন অধ্যক্ষের চাকরি। অসুস্থতার খবর পেয়ে জার্মানি থেকে ম্যাক্সমুলার চিঠি লিখেছেন অক্ষয়কুমারকে। ১৮৮৩ সালের ৩১ অগস্ট লেখা চিঠিতে উদ্বেগ: 'আপনার অসুস্থতার খবর শুনে খুব দুঃখিত। আশা করি আপনি অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবেন।'

অসুস্থতা নিয়েই করেছেন 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইটির কাজ। হিন্দু ধর্মের নানা শাখাপ্রশাখা, নানান সম্প্রদায়, বিচিত্র আচরণ। অন্যান্য ধর্মও খুব ব্যতিক্রম নয়। এমনই ১৮২টা সম্প্রদায়কে নিয়ে দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই বইয়ে তিনি প্রকাশ্যে ভাববাদী চিন্তাকে আক্রমণ করেছেন। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণকে মানসিক রোগ বলতেও ছাড়েননি। সব থেকে বড় কথা, এই বইয়ের অনেকটাই তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষার ফসল। রোগ-অসুখ তাঁর নিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এক দিন গাড়িতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়। পথে এক ধাঙড়কে দেখতে পেয়ে অক্ষয়কুমার গাড়ি থামাতে বললেন। মানুষটি তাঁর পূর্বপরিচিত। ইতিমধ্যে আরও কয়েক জন ধাঙড় সেখানে এসে উপস্থিত। গাড়ি থামিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অক্ষয়কুমার শুনলেন ধাঙড় সমাজের রীতিনীতি, দেবদেবীর পূজার্চনার বৃত্তান্ত। এ কথা-সে কথায় অম্বিকাবাবুও দু-একটা প্রশ্ন করলেন। কিন্তু ধাঙড়রা তাঁকে উত্তর দেবে না। অক্ষয়বাবুকে এত খাতির কেন? এক ধাঙড়ের উত্তর: "উনি আমাদের দেশে গিয়াছিলেন, উনি আমাদের (জাতের) ভেদ মারিয়াছেন।"

ক্ষমাপ্রার্থনা করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার। আলাদা আলাদা সময়ে তিনটি পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়: ১২৯০ বঙ্গাব্দের ১১ বৈশাখ 'সোমপ্রকাশ'-এ, ১২৯১-এর ৮ বৈশাখ 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় এবং ১৮৮৫-র ১০ জুন 'নিউজ় অব দ্য ডে' সংবাদপত্রে। অনুরাগীরা তাঁকে নানান বিষয়ে চিঠি লিখতেন, তিনি অসুস্থতার জন্য উত্তর দিতে পারতেন না। মনে মনে গ্লানি বোধ করতেন। তাই এই ক্ষমাপ্রার্থনা। আর একটি 'ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন' অবশ্য বেশ মজার। "আমার এক ভৃত্য গত শুক্রবার প্রাতঃকালে স্বর্ণালঙ্কারে ও নগদে প্রায় আড়াইশত টাকা হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহাকে বমাল সহিত ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে উচিতমত পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।" 'সম্বাদ প্রভাকর'-এ ১২৬০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনে গয়নার বিবরণে আছে: হেলে হার ১ ছড়া, কণ্ঠমালা ১ ছড়া, বাজু ২ খানা, বালা ৪ গাছা।

অক্ষয়কুমার দত্ত শারীরিক অসুস্থতার জন্য বেশি ঘোরাঘুরি করতে পারতেন না। ফলে তাঁর সামাজিকভাবে উপস্থিতি ক্রমশ কমে আসছিল। সেটা অবশ্য সাপে বর হয়েছিল। প্রচন্ড শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাকরি করা থেকে বিরত হন। কলকাতা থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে চাইছিলেন। ১৮৫০ এর দশকে তিনি বালিতে জায়গা দেখে বাড়ি করে থাকতে শুরু করলেন। তাঁর জীবনের শেষ তিরিশটি বছর (১৮৫৬-১৮৮৬) তিনি বালিতে কাটান। আজ দেওয়ান গাজী তালায় যেটি 'হরমিলার ডক' বলে পরিচিত, সেটি তাঁর শেষ জীবনের বসতবাড়ি। লাগোয়া জমিতে তৈরি করলেন 'শোভনোদ্যান'- উদ্ভিদবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্র। অক্ষয়কুমার রচিত তিন খণ্ড 'চারুপাঠ' ছাত্রমহলে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। তাই বিদ্যাসাগর এই উদ্যানের নাম দিয়েছিলেন 'চারুপাঠ চতুর্থ ভাগ'। বাড়ির ভিতরেও তৈরি করেছিলেন একটি ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। সেখানে ছিল বিভিন্ন যুগের প্রস্তরখণ্ডের নমুনা, ফসিল, প্রবাল প্রভৃতি। শরীর সঙ্গ দিত না, তবু কলকাতা জাদুঘরে বা শিবপুর বোটানিক্যাল উদ্যানে যেতেন

নিয়মিত। জাদুঘরে লাঠি নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বলে সঙ্গীর কাঁধে ভর রেখে চলতে হত। সঙ্গীর হাতে থাকত বই। সেখানে ছাপা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু।

৩৮ রকমের বৃক্ষ, ১৫ রকমের ফুল বা সুদৃশ্য নানা গাছ, ১৬ রকমের মশলাজাতীয় গাছের কথা পাওয়া যায় নানা জনের বিবরণে। নিরিবিলি প্রকৃতির সান্নিধ্যে বালির বাড়িতে বসে নিরলস গবেষণার ভিত্তিতে আমৃত্যু যে কাজগুলো করে গেছেন সেগুলো আমাদের অক্ষয় ঐতিহ্য, অমূল্য ঐতিহ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা তাঁকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিইনি, আজও দিচ্ছি না। তিনি যে সময় কালজয়ী কাজগুলো করে গেছেন, তখন বাংলাদেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না এইসব কাজ করার।

বালির বাড়িতেই একা, নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন 'ধর্ম্মনীতি'র লেখক। পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে দূরত্ব ছিল। অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র রায় তাঁর দেখাশোনা করতেন। ১৮৮৬ সালের ১৮ মে জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমার দত্ত ছেষট্টি বছর বয়সে যখন প্রয়াত হন, তখন তাঁর পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চার বছর বয়স। এই সত্যেন্দ্রনাথই পরে বাংলা কবিতায় 'ছন্দের জাদুকর' বলে খ্যাত। পিতামহকে 'হোমশিখা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করে লিখেছিলেন 'বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল/ আমার পূজ্যপাদ পিতামহ...।'

চিনি, ময়দা, সুতার কল, কাগজের কল, টাঁকশালে যেতেন অক্ষয়কুমার, যন্ত্রবিজ্ঞান কী ভাবে কাজ করে দেখবেন বলে। সমুদ্রভ্রমণে গিয়ে দূরবিন চোখে পৃথিবীর গোলাকৃতির পরীক্ষা করতেন, জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলোচনা করতেন নানা দেশ নিয়ে। ইচ্ছে করে বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি 'অশুভ' দিনক্ষণ দেখে ভ্রমণে বেরোতেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা'র শরিক হতেন। বাংলা ও ইংরেজি ছাড়াও জানতেন সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, ফরাসি ভাষা। বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চা ছাড়াও গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, নৃবিজ্ঞান, বিবর্তনতত্ত্ব, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ভারতের পুরাতত্ত্বের চর্চা করেছেন।

নিরিবিলিতে বালির বাড়িতেই রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত বই 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন এই অসাধারণ বইটির জন্য অক্ষয়কুমার দত্তের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বইয়ের দুটি খণ্ড এই বাড়িতে বসেই তিনি লেখেন। প্রথম খণ্ড ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ড তেরো বছর পর ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়।

অক্ষয় দত্তের এই একখানা মাত্র বই কালের অবলেপন এবং উত্তরসূরিদের অবহেলার কবল থেকে বেঁচে গেছে। আমাদের কাছে তাঁর প্রদত্ত 'অক্ষয়' সম্পদ হয়ে টিকে থেকেছে। ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়ের ইতিহাস মানে তো ভারতের যাবতীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই ইতিবৃত্ত বর্ণন। মনে হয়, তিনি সচেতনভাবেই ধর্মীয় শব্দটি বাদ দিয়ে উপাসক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভারতে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা নেহাত খুব কম নয়। তিনি হাত দিলেন একশ বিরাশিটি সম্প্রদায়ের কাহিনিতে। পুরোটাই তিনি একা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে করে সম্পন্ন করেছেন। বইপত্র পড়ার পাশাপাশি সরাসরি ক্ষেত্রসমীক্ষা করে অনেক রকম তথ্য পেয়েছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে থেকেছেন, মিশেছেন, কথা বলেছেন, বুঝেছেন। তবে লিখেছেন। এই কারণেই ভারতীয় সমাজ তথা ধর্মীয় সমাজের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাপেক্ষে বইটির আজও একটি আকর গ্রন্থমূল্য আছে।

আরও লক্ষণীয়, যুক্তিবাদী বিজ্ঞানলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম বইটিতে ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র ধর্মসংস্কৃতি বিশিষ্ট মানব গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর বহুদিনের পরিশ্রমজাত ও বৈজ্ঞানিক বিধিসম্মত অনুপুঙ্খ ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন; আর দ্বিতীয় বইতে তিনি তাঁর নিজস্ব দার্শনিক বিচার, ভারতীয় চিন্তাশীলদের বিভিন্ন দার্শনিক মতের পরিচয়, পারস্পরিক তর্কবিতর্ক খণ্ডন-বিখণ্ডন, ভারতীয় প্রাচীন মনন-ঐতিহ্যে নিরীশ্বরবাদ এবং বস্তুবাদের নানা শাখার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ভারত গ্রিস ও রোমের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে ভাষা তথা অন্য নানা বিষয়ে সাদৃশ্য, ইত্যাদি বহু চিত্তাকর্ষক বৌদ্ধিক উপকরণ তুলে ধরেছেন। এখানে আছে শুধু যুক্তিবাদী বিচারধারা নয়, যুক্তিবাদের মননশীল ফসল। এতে পাওয়া যায় শুধু মাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আবাহনী নয়, আগমনি নয়, তার পাশাপাশি আমরা পাই সমাজ সংস্কৃতি ভাষা দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অখণ্ড বিজ্ঞানমানস প্রয়োগের ফলস্বরূপ এক উৎকৃষ্ট বিচারপদ্ধতি ও অভাবিতপূর্ব সিদ্ধান্তরাশি। প্রথম বই শেখায়, কোনো একটি সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ে কীভাবে তথ্যানুসন্ধান

করতে হবে। দ্বিতীয় বই থেকে শেখা যায়, কোনো একটা দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে দীর্ঘপ্রচলিত বিভ্রান্তিগুলিকে কীভাবে কাটানো যায়। বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর স্বাধীন ও মুক্তমন অধ্যয়নের দ্বারা অর্জিত উপলব্ধি তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেন এইভাবে: "এখন বেদপ্রাণ হিন্দুমণ্ডলি! শ্রবণ কর! তোমাদের প্রাচীন মীমাংসকগণ অর্থাৎ বেদমন্ত্রের মীমাংসাকারী পূর্বকালীন আচার্যগণ না ঈশ্বরই মানিতেন না দেবতাই স্বীকার করিতেন। তাঁহারা নির্দেব ও নিরীশ্বর।" ম্যাক্সমুলার এই বইটি সম্বন্ধে জেনে অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রসংসাসূচক চিঠি লেখেন।

আসলে অক্ষয়কুমার আমাদের ভাবতে শিখিয়েছেন বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ, জীবন এবং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি, তার নিগুঢ় তত্ত্বগুলি। তার জীবনী এবং রচনা সংগ্রহের সংকলক এবং 'অক্ষয়-সুধা' (১৯২৪) নামের পুস্তকের রচয়িতা শিবরতন মিত্র যা বলেছেন, বাোধহয় সেটাই অক্ষয়কুমার সম্পর্কে এবং তার বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। তিনি উপরাোক্ত পুস্তকের 'অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্গসাহিত্য' শিরাোনামে লিখেছেন, "অক্ষয়কুমার প্রধানত বৈজ্ঞানিক। আজ ইংরেজ জাতি, জর্ম্মাণ জাতি, ফরাসী ও মার্কিণ জাতি বৈজ্ঞানিকতায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকতার প্রতিভা একদিনে হয় নাই। বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধির অনুশীলনে, ইংরাজ জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মনীষী বেকন হইতে জন স্টুয়ার্ট মিল পর্যন্ত মনীষীগণ কি কঠোর তপস্যা এবং কি ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ...এই মানুষকে প্রত্যক্ষ্য স্কুল ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার সমূহ পর্যবেক্ষণ করাইয়া অধ্যবসায় সহকারে সেই সমুদায় বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ করিবার সহিষ্ণুতায় দীক্ষিত করিতে বেকনকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। আজ ইংরাজ যে গৌরবান্বিত, তাহার কারণ এই বৈজ্ঞানিকতা। অক্ষয়কুমার আমাদের দেশে এই বৈজ্ঞানিকতার প্রতিষ্ঠার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সেই কঠোর তপস্যায় আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকের যাবতীয় লক্ষণ অক্ষয়কুমারের চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়।"

'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' প্রাপক গবেষক আশীষ লাহিড়ী আক্ষেপ করে বলেছেন, 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইটি যদি ইংরেজিতে তর্জমা করা যেত তবে প্রমাণ করা যেত তাঁর চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য অন্যদের থেকে কতযুগ এগিয়ে ছিল। সেটা সামাজিক দিক থেকে, দার্শনিক দিক থেকে, ইতিহাসের দিক থেকে এমনকি সাহিত্যগত দিক থেকে। বাংলাদেশের কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অক্ষয়কুমার দত্ত গবেষক সাইফুল ইসলামের কথায়, 'আমরা যা কিছু আত্মসাৎ করতে পারি না তা ভস্মসাৎ করার চেষ্টা করি। ওনার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ওনার পাণ্ডিত্য, অকাট্য যুক্তির জন্য তৎকালীন বঙ্গসমাজ ওনাকে আত্মসাৎ করতে পারেনি।'

৩৬৭, জিটি রোড, বালি, হাওড়ায় তাঁর সাধের শোভনোদ্যান বাড়িটি এখন ভগ্নপ্রায়, অন্তিম দশা। আজ অবধি কোনো দেখভাল, সংরক্ষণ হয়নি। যদিও ২০০৬ সালে তদানীন্তন রাজ্য সরকার 'হেরিটেজ' -এর একটি ফলক লাগিয়েই তার দায়িত্ব সম্পাদন করেছে। বর্তমান সরকারও উদাসীন। এখন বাড়িটির অবস্থা করুণ। অতিসত্বর আশু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। বহু স্মৃতিবিজড়িত বর্তমানে জরাজীর্ণ বাড়িটিকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে অক্ষয়কুমার দত্তের কাজের উপর একটা গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারলে আপামর বাঙালি তথা ভারতবাসীরই উপকার হবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। অর্থাৎ তাঁরও দুশো বছর পূর্ণ হল। ২০২০ সালের, ১৫ জুলাই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ ও প্রথম বাঙালি সমাজবিজ্ঞানী অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সকল কারণে আমাদের হৃদয়জুড়ে আছেন ঠিক একই কারণে বা তার চেয়েও বেশি কারণে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রাতঃস্মরণীয় হওয়ার কথা। কিন্তু এই মহান মনীষীর আদর্শ, চিন্তাধারা, অক্ষয় কাজ কোন কিছুই আমরা সঠিক মূল্যায়ন করিনি। আজও করছি না।

বাঙালি তাঁকে খুব যে মনে রেখেছে, বলা যাবে না। অবশ্য ঘটা করে প্রতি বছর তাঁর ছবিতে ফুলচন্দন দিলে বা পঞ্চধাতুর মূর্তি স্থাপন করলেও খুব কিছু এসে যেত না। বেঁচে থাকতেই ভাববাদের উল্টো পথের এই একলা পথিক লিখেছিলেন: 'যদি বা আমার কীর্ত্তি স্থায়ী হয়, কিন্তু আমি তো চিরস্থায়ী নই।... মৃত্যুর পরে আমি সে কীর্ত্তি ঘোষণা শুনিতে আসিব না।'

ধর্মতত্ত্ব থেকে ভাষাবিজ্ঞান পর্যন্ত যে দীর্ঘপ্রকার জ্ঞানভূমির মধ্যে ছিল তাঁর অনায়াস পদচারণা, বাঙালি পাঠককে হাত ধরে সেই জ্ঞানজগতের সিংহদ্বারে তিনিই পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর কাছে আধুনিক ভারতবাসীর ঋণ অপরিশোধ্য। মাতৃভূমি থেকে যাবতীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কদাচার ও দুর্বলতা দূর করাই ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের ব্রত। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, কেন ভারতের যুক্তিবাদীরা এযাবৎ অক্ষয়কুমার দত্তকে বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে সামনে তুলে আনার প্রয়াস করলেন না? বিনয় ঘোষ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রমুখর ভারতীয় দর্শন ও প্রাচীন সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে এত ভালো ভালো কাজ আছে, অথচ তাতে অক্ষয়কুমার দত্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেন না কেন, “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়” বইটি কোন জায়গা আদায় করতে পারল না কেন - মনে জাগে বিস্ময় প্রশ্ন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে বাঙালিদের চিন্তা জগত থেকে তিনি কার্যত বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে গেছেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অক্ষয়কুমার দত্তের আদর্শ ও দর্শন খুবই প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে ধর্মীয় উন্মাদনা ও অন্ধবিশ্বাসের যাঁতাকলে অনেকক্ষেত্রে আমরা আলোর থেকে অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছি। এটা যদি ঠেকাতে হয় তবে সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার আমাদের কাছে অক্ষয়কুমার দত্ত।

★ তথ্যঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার: আনন্দবাজার পত্রিকা, দীপক সাহা - আপনপাঠ ওয়েবজিন, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (১ম খণ্ড), গবেষক আশীষ লাহিড়ী, গবেষক ও শিক্ষক অর্ণব চ্যাটার্জি, শিবপ্রসাদ মিত্র, শিক্ষক অনু বর্মন, সাহিত্যিক কুশল মৈত্র, সুকুমার সেন - 'বাংলার সাহিত্য ইতিহাস', সাহিত্য অ্যাকাদেমি, নতুন (পৃঃ ১৬৭), আমিনুল ইসলাম - নবজাগরণ ডট কম, সংবাদ ডট নেট ডট বিডি।

“অলংকারের জন্য ললনাকূল কত আগ্রহ। যেন জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উহার উপর নির্ভর করে। তাই দরিদ্র কামিনীগন স্বর্ণ রৌপ অলংকার হাতকরি না পাইয়া কাঁচের চুরি পড়িয়া দাসত্ব জীবন। সার্থক করে । যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে তাহার মত হতভাগিনী এ জগতে যেন আর কেউ নাই! অভ্যাসের কি ওপর মহিমা। দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাস সূচক গহনাও ভালো লাগে”

-বেগম রোকেয়া- মতিচুর (প্রথমখন্ড)

মিথ বনাম বাস্তবতা: বিদ্যাসাগর

-দেবস্মিতা

বিদ্যাসাগর নামটা শুনলেই চোখের সামনে ফুটে ওঠে হাফ টাক মাথা, বেঁটে এক ভদ্রলোক। গায়ে চাদর জড়ানো, ধুতি পড়া লোকটি নিজের কর্তব্যে, কর্মে অবিচল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলা ভাষার নিজস্ব অক্ষরজ্ঞান বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ রোধ প্রভৃতি একের পর এক সমাজ সংস্কারক কাজ করে গেছেন। বাংলা নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বলা চলে তাঁকে। এ হেন মানুষকে নিয়ে বাংলায় গড়ে উঠেছে একের পর এক গল্প। প্রবাদপ্রতিম মানুষটিকে ঘিরে যত কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে কথা বলবো সেগুলো নিয়েই।

বিদ্যাসাগর মানুষটি খুব মেধাবী ছিলেন। সারাদিন কলেজ, কাজ সেরে রাতে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পড়তেন। অনেক গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা চালাতেন তিনি। ঘুম যাতে না পায় তাই নিজের টিকি নাকি ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রাখতেন। এই কথা বহুল প্রচলিত। কিন্তু বাস্তবিক বিষয়টি এমন ছিল না একেবারেই। ল্যাম্পপোস্টে বাঁধার মতো লম্বা টিকি তাঁর ছিল না। বিষয়টি অতিরঞ্জিত। পড়াশোনার প্রতি অসম্ভব নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ছিল, যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় লোকমুখে গল্পটা যুগ যুগ ধরে চালু রয়েছে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন ভীষণ মায়ের আজ্ঞাবহ। বাধ্য সন্তান। উনি নাকি একবার মা জরুরি তলব করায় দামোদর নদ সাঁতরে পেরিয়েছিলেন। ঘটনা এরকম, মা ছেলেকে ডেকেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছুটি পাননি। দু তিন দিন অপেক্ষার পরও ছুটি না পেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন চাকরি ছেড়ে হলেও মায়ের কাছে যাবেন। পরেরদিন তাঁর ভাইয়ের বিয়ে। তখন বর্ষাকাল। তিনি কলকাতা থেকে দামোদরের তীরে এসে দাঁড়ালেন। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও কোনও মাঝি না দেখতে পেয়ে তিনি সেই ভয়ঙ্কর নদ সাঁতরে পাড়ি দেন। লোকমুখে এ গল্প বহুল প্রচলিত। বিদ্যাসাগরের বাড়ি মেদিনীপুরে। তিনি গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। দামোদর তাঁর যাওয়ার পথে পড়ার কথাই নয়। দামোদর সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায়। তার থেকেও বড় কথা যার যাওয়ার তাড়া থাকবে সে নিশ্চয় ঘুরপথে যাবে না। এ কথা স্বীকার করেছিলেন স্বয়ং তাঁর ভাই শম্ভুনাথ।

তাঁকে নিয়ে এরকম নানা জনশ্রুতি আছে। তবে বিদ্যাসাগর সত্যিই মাতৃআজ্ঞা ভীষণ পালন করতেন। তিনি সারাজীবন মেয়েদের জন্য লড়ে গেছেন। তাঁদের পড়াশোনা, সমাজে মান মর্যাদা বৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের জন্য সংগ্রাম চালিয়েছেন। কিন্তু খুব অদ্ভুত ব্যাপার নিজের স্ত্রীকে কোনওদিনও লেখাপড়া শেখাননি। যে মানুষটা মেয়েদের জন্য এত করেছেন সে নিজের স্ত্রীকে সেই সুবিধে করে দেননি। কী আশ্চর্য তাই না! এর কারণ কিন্তু তাঁর মা। বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী চাননি ছেলের বউ লেখাপড়া শিখুক। যে মানুষটা আজীবন লড়াই করেছেন মেয়েদের হয়ে সেই মানুষটার বউই অশিক্ষিত রয়ে গেলেন। ঠিক যেন প্রদীপের তলা। যে প্রদীপ গোটা ঘর আলোয় ভাসিয়ে দেয়, তার নীচে কিন্তু অন্ধকারই থাকে।

বিদ্যাসাগর মনীষী হলেও আদতে একজন মানুষই। তাঁকে নিয়ে নানা গল্প কথা রচিত হয়েছে। দেবতার আসনে বসানো হয়েছে। তাঁরও কিছু ভুল ভ্রান্তি আছে। সেইসব বিষয়গুলি তুলে ধরা হল। এই দিকগুলো অনেকেই জানেন না। যে কোনও মানুষের মহান কাজকে যেমন শ্রদ্ধা করা উচিত তেমন তাঁর প্রতিটা কাজের ঠিক ভুল বিচার করা উচিত। এরপরও বিদ্যাসাগর ওই একজনই। তিনি যেভাবে তখনকার সমাজের মাথাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নারী স্বাধীনতায় এগিয়ে গিয়েছিলেন, শুধু তাই নয় বাংলা ভাষায় বর্ণপরিচয় তৈরি করে সেই ভাষার দ্বার সকলের জন্য খুলে দিয়েছিলেন তাঁর জন্য তিনি প্রণম্য থাকবেন।

হাজার বছর আগে ইসলামের জন্ম হয়নি

- পঙ্কজ কুমার ভাদুড়ী

৫ হাজার বছর আগে, পৃথিবীতে একটাও মুসলমান ছিলো না। মাত্র দেড় হাজার বছর আগেই, পৃথিবীতে একজনও মুসলমান ছিলো না। অর্থাৎ পাঁচ হাজার বছর আগে এই ভারতবর্ষেও, কোনো মুসলমান ছিলো না। স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু পাঁচ হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা হয়েছিলো। কাদের মধ্যে হয়েছিলো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ? কৃষ্ণের সময়, দ্বাপর যুগের শেষে, সনাতন ধর্মাবলম্বী একই পরিবারের রক্ত সম্পর্কিত ভাইয়ে-ভাইয়ে যে যুদ্ধ হয়েছিলো, যে নারকীয় আত্মীয় নিধন, নির্বিচারে আসমুদ্রহিমাচলের মানুষের চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছিলো, তারই নাম কুরুক্ষেত্র। ইগোর লড়াই, ক্ষমতার লড়াই, কুৎসা, ষড়যন্ত্র, সিংহাসন দখলের রাজনীতি, প্রেম, যৌন ঈর্ষা, ব্যভিচার, বহুগামীতা, হত্যাযজ্ঞ- মহাভারত এই, বা হয়তো তার থেকে অনেক, অনেক বেশি কিছু। কিন্তু যাইইহোক, যে রক্তগঙ্গা বয়েছিলো, তাতে মুসলিমদের কোনো হাত ছিলো না।

রাম। আজ যে নামটাকে জপমালা বানিয়ে, ভারতবর্ষ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ, দাঙ্গাবাজ হয়ে উঠছে- সেই রামের সময়, রামায়ণের সময়ও, ভারতবর্ষে একজনও মুসলমান ছিলো না। প্রায় ৭০০০ বছর আগে, রামের জীবনে কোনো মুসলমান না থাকা সত্ত্বেও, রামকে প্রাসাদ রাজনীতি ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজের পরিবারকে ফেলে, রাজসুখ ফেলে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল। একে বলে Palace Ordeals. পৃথিবীতে একজন মুসলমান না থাকা সত্ত্বেও, রামকে স্বধর্ম-স্বজাতির মানুষের হাতে হেনস্থা হয়ে, বনবাসে গিয়ে পর্ণ- কুটিরে থেকে, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের মাঝখানে সীতাসহ বসবাস করতে হয়েছিলো। রাজা দশরথ মুসলমান ছিলেন না, কিন্তু তাঁর তিনজন রানী ছিলেন। এবং তিনি তার লিবিডোর কারনে বলুন, হৃদয়ের দুর্বলতার কারনে বলুন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলুন- সন্তানকে সাপ-শ্বাপদের মধ্যে, দৈত্য-দানো, রাক্ষসখোক্ষসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন।

পার্টিসানের পর পূর্ব পাকিস্তান আর পাকিস্তান মিলে, তৈরি হলো একটা রাষ্ট্র। দুটো দেশই তৈরি হলো মুসলমানদের জন্য। ভারতের মূল ভূখণ্ড হিন্দুদের। পূর্ব পাকিস্তান আর পাকিস্তান মুসলমানদের। কিন্তু ধর্মের মিল কী তাদের এক দেশ, এক জাতি হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে পারলো? পারলো না। ধর্মীয় ঐক্য বলে আদৌ যদি কিছু থাকে, তা একটা প্রতিপক্ষ তৈরি করে নিয়ে কিছুকাল বজায় থাকে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রতিপক্ষ সরে যাওয়ার পর, ধর্মীয় ঐক্য ভূলুণ্ঠিত হতে দশ মাস সময় লাগে না। ইতিহাস কি দেখাচ্ছে আমাদের? মুসলমানকে মুসলমানের হাতে তুলে দিয়ে, কি হলো তার পরিণতি? ৩০ লক্ষ হত্যা। ৭ লক্ষ নারী ধর্ষণ। একটা এমন মুক্তিযুদ্ধ, যার স্মৃতি এখনো গোটা বাংলাদেশকে তাড়া করে বেড়ায়। মুসলমান মানেই তার মানে, মুসলমানের রক্ষাকর্তা নয়! মুসলমান মানেই তার মানে, মুসলমানের মান-সম্মান, ধন-প্রাণের জিম্মি নয়! মুসলমানও মুসলমানের দুঃস্বপ্নের কারন হতে পারে।

নারী-পুরুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, শরীর-মন জড়িয়েমড়িয়ে কি যে একটা ব্যাপার হয়। কিন্তু আবার ছাড়াছাড়িও হয়ে যায় কেমন। হিন্দু ছেলে, হিন্দু মেয়ে। তাও ডিভোর্স হয় কেনো? মুসলিম ছেলে, মুসলিম মেয়ে। তাও তালাক হয় কেনো? তার মানে হিন্দু বা মুসলিম হওয়াটাই, এক সঙ্গে থেকে যাওয়ার একমাত্র ক্রাইটেরিয়া নয়? হিন্দু বা মুসলিম হওয়াটাই, সম্পর্কে টিকে থাকার একমাত্র যোগ্যতা নয়? ধর্ম এক হওয়ার পরও, এতো বিরোধ তৈরি হয়? ধর্ম এক হয়েও, এতো বিশ্বাসঘাতকতা করে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে? এতো ক্ষতি করে? এতো আঘাত দেয়? দেয়। কারন ধর্মের মিল আসলে একটা মিথ্যে মিল। সাজানো ব্যাপার। ধর্মের মিল বলে আসলে কিছুই হয় না। ধর্মের মিল মনের মিল তৈরি করতে পারে না।

একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, সমস্ত জীবনে যতোবার অপমানিত হয়েছি, যতোবার প্রবঞ্চিত হয়েছি, যতোবার আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেছে, যতোবার আমার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যতো অন্যায় হয়েছে আমার সঙ্গে, অফিসে, কলেজে, কোর্ট-কাছারিতে, বাসে-ট্রামে, পুলিশ স্টেশনে, পরিবারের ভেতরে-বাইরে, সমস্ত খারাপ ব্যবহার, যাবতীয় অসভ্যতা, কূটকচালি, নোংরা সম্ভাষণ - যা যা সহ্য করতে করতে আমাকে পথ চলতে হয়েছে, সব কিছুই কি আমার কাছে মুসলিমদের কাছ থেকেই এসেছিলো? তাই কি আসে? নাহ! মুসলমানরাও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, এই একই প্রশ্ন করুন নিজেকে। দেখবেন উত্তর হবে একই। না। না। আর না। দেখবেন আপনার চারপাশের যে মানুষগুলোর ব্যবহারে কান্না গলায় এসে আটকে গেছে, তারা সবাইই হিন্দু নয়।

৭০০০ বছর আগেও ভাইয়ে ভাইয়ে মিল ছিলো না। আজও নেই। পরেও থাকবে না। ক্ষমতা, অর্থ, ধনসম্পত্তি, নারী- এসব নিয়ে মানুষে মানুষে ক্ষমতা দখলের প্রলয় চলবেই। তারপরও শুধু রাজনীতি পয়েন্ট আউট করে দেবে, Hindu's enemy Muslim, Muslim's enemy Hindu।

আজ একজন ধার্মিক মানুষের জীবন নিয়ে কিছু বলবো আমি। তিনি শুধু একজন ধার্মিকই নন, তিনি এই সময়ের শ্রেষ্ঠ একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। লাহোরের ফজল মসজিদে নিয়মিত নামাজ পড়তেন তিনি। মসজিদের ঈমাম সাহেব লক্ষ্য করতেন তিনি খুতবার সময়টিতে প্রায়শই কি যেনো লিখছেন তাঁর একটা নোটবইয়ে। ঈমাম সাহেব পরে জেনেছিলেন, তিনি আসলে সেই নোট বুকে খুতবা থেকে পাওয়া ইসলামী বয়ান লিখতেন না, তিনি লিখতেন ফিজিক্স এর সম্ভাব্য এক্সপেরিমেন্টস গুলো যা তাঁর মাথায় আসতো, যেনো ভুলে না যান তাই লিখে রাখতেন।
তাঁর ঘরে সব সময় থাকতো একটি কুরআন, কয়েক হাজার গানের লং প্লে রেকর্ড আর তার চাইতেও বেশী সংখ্যক বই।
ধর্ম দিয়ে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা কে "ষ্টুপিড আইডিয়া" বলতেন তিনি। কেননা দুটি সম্পূর্ণ দুই মাত্রার বোঝাপড়ার বিষয়। একটি পদ্ধতিগত আরেকটি নিছক ব্যক্তি মানুষের। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত নিয়ে চিন্তা করার চাইতেও তাঁকে পিড়িত করতো পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় একশো বছরেও কেনো একজন গনিতের পিএইচডি তৈরী করতে পারলোনা সেই অপমানজনক গ্লানি।
তিনি ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন - পারটিকল ফিজিক্স এর "ক্ল্যাসিক্যাল মাইন্ড"দের একজন। তিনি নোবেল পুরুস্কার জিতেছিলেন। তিনি তাঁর নোবেল পুরষ্কার টি দান করেছিলেন শিক্ষা খাতে। তাঁর সাথে আরও দুজন নোবেল পেয়েছিলেন তাঁদের একজন প্রফেসর ওয়েইনবারগ বলেছিলেন - "আমি কখনই তা করবোনা, আমারটা আমি রেখেছি ব্যাংকে"। ভারতে তাঁর অসুস্থ ও শয্যাগত শিক্ষকের হাতে নোবেল মেডেলটি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, গুরুজি এই নোবেল আসলে আপনার পাওনা, কেননা আপনিই আমাকে গনিত শিখিয়েছিলেন।
এই স্কলারের ব্যক্তি জীবন কে তছনছ করে দিয়েছে পাকিস্তানের সুন্নী মুসলমানেরা, জামাতে ইসলামী, জুলফিকার আলী ভুট্টো আর প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এর শাসনকাল। সংগঠিত ধর্ম কতটা অন্ধ, ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে তার নজির হচ্ছে এই ধার্মিক মানুষটির পাকিস্তান ত্যাগ আর হাজার হাজার কাদিয়ানীদের উপরে নেমে আসা সুন্নী নিপীড়নের ইতিহাস। সুন্নী মুসলমানেরা তাঁর কবরের এফিটাফ থেকে "মুসলিম" শব্দটিকেও হাতুড়ী দিয়ে ভেঙ্গে মুছে দিয়েছে।
অন্যদিকে ব্যক্তি মানুষ কতো বিচিত্র ভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মোকাবিলা করে তার হাজারটা উদাহরনের একটি হচ্ছে এই মানুষটির পেশাদার জীবন।
এই লেখাটির সময় মাথার ভেতরে ঘুরছিলো বুয়েটের ছাত্রটিকে নিয়ে করা তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যগুলো......... ছিঃ ছিঃ বুয়েটে পড়ে "নামাজ পড়ে" তাহলে সেকি "বিজ্ঞান মনস্ক"? পরে নিজেকেই বোঝালাম ... কিসের মধ্যে কি নিয়ে আসছি আমি... বরং এই মহান মানুষটিকে নিয়েই ভাবি।
কেইমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইন্ট জন হলের লম্বা করিডোরের মাঝে মুখোমুখি আছেন - কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ারথ ও এই মানুষটি, যাঁর নাম প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুস সালাম। সব কিছু ছাপিয়ে এটাই হয়ে থাকবে ইতিহাস।
না শুধু ছবি নয়, আরেকটি বিরাট প্রতিষ্ঠান সালামের "বিউটিফুল মাইন্ড" কে বয়ে নিয়ে যাবে ইতিহাসে, সেটা হচ্ছে ইতালীর ত্রিয়েস্ত শহরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইসিটিপি (ICTP)।
তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিলো অনগ্রসর দেশগুলোর পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রদের উন্নত বিশ্বের গবেষণার সাথে যুক্ত করা।
তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রধান উন্নত দেশ বলে দাবীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেইন এই প্রত্যেকটি দেশ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের বিরোধিতা করেছিলো। এদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিলো একটি "অপ্রয়োজনীয়" উদ্যোগ।
সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশিকতা কেবল দেশ দখল করেই হয়না, আরও অসংখ্য উপায়ে হয়। বোঝার জন্যে শুধু দরকার আমাদের বোধ আর কিছু তথ্য।
মানুষ অমর হন তাঁর কাজ দিয়ে। ধর্ম বিশ্বাস দিয়ে নয়। মানুষ "বিচার" করা উচিত তাঁর কাজ দিয়ে, ধর্ম বিশ্বাস দিয়ে নয়। কেননা এই মানুষটি ও জিয়াউল হক দুজনেরই ধর্ম বিশ্বাস ইসলাম।

তৃতীয় লিঙ্গ

-পার্থ প্রতিম পাল

ক্রোমোজোম এবং শারীরিক যৌনতার দিক থেকে মানুষ দুই ধরণের হয় নারী ও পুরুষ। এই যৌন দ্বি-দ্বন্দ্বের বাহিরে আরেকটি অসাধারণ বৈচিত্র্য মানব সমাজে লক্ষ্য করা যায় যা কিনা আন্তঃলিঙ্গ বা আমাদের উপমহাদেশে হিজড়া হিসাবে পরিচিত আর আজকাল অনেক ভদ্রতা দেখিয়ে বলে তৃতীয় লিঙ্গ।

স্বাভাবিকভাবে ছেলে শিশুর সেক্স ক্রোমোজোম X ও Y আর মেয়ে শিশুর সেক্স ক্রোমোজোম X ও X ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত হয়। আর সেক্স ক্রোমোজোমের ত্রুটির কারণে একটি শিশু লিঙ্গ নির্ধারণে জটিলতা দেখা দেয়। এই ত্রুটির ফলাফল হলো তৃতীয় লিঙ্গ মানে না পুরুষ, না নারী। বলা হয়ে থাকে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা আসলে জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ নিষিক্তকরণ এবং বিভাজনের সময় জেনিটিকসের কারণে অথবা সেক্স ক্রোমোজমের কার্য ত্রুটির কারণে কিছু অস্বাভাবিক সেক্স ক্রোমোজোমের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন X-Y-Y অথবা X-X-Y। এই শিশুরা পরিপূর্ণভাবে কোন নির্দিষ্ট যৌন আচরণের অংশ নয়। একজন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের লিঙ্গের পূর্ণাঙ্গতা নারী পুরুষের সকল দৈহিক বৈশিষ্ট্য হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের দৈহিক বহিঃ আকৃতি পুরুষের মত কিন্তু আচরণ নারীর মত।

আবার এই আন্তঃলিঙ্গ বা হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যেও রয়েছে প্রকারভেদ। তাঁদের মধ্যে একটি হচ্ছে এই উর্দ্ধাঙ্গ নারী ও নিম্নাঙ্গ পুরুষ। এদের উর্দ্ধাঙ্গে নারীদের মতো সুডৌল এবং পুষ্ট স্তন থাকে ও নিম্নাঙ্গে থাকে পুরুষের মতো সতেজ লিঙ্গ। অর্থাৎ একই অঙ্গে একই সঙ্গে নারী ও পুরুষ। এরাও আবার দুই প্রকার, মানসিকতায় নারী ও পুরুষ চেতনার।

এরা তিন ধরণের মানুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করে থাকেন যথা- সমকামী নারী, সমকামী পুরুষ ও উভয়কামী নারীপুরুষের সঙ্গে। মূলত এরা সেক্স করে রোজগার করেন মানে বেশ্যাবৃত্তি। বাজারে এদের চাহিদাও রয়েছে খুব। সাধারণত এরা ধনীদের যৌনসঙ্গী হয়ে থাকেন। এছাড়া পর্ণোছবিতেও এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, ইন্টারনেট দুনিয়ায় এদের পর্ণোছবির ছড়াছড়ি। scemale বা scemale porn বা Shemale porn লিখে সার্চ করলেই দেখতে পাবেন অসংখ্য ভিডিও।

তাই প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ এই মানুষগুলোকে অবহেলা বা ব্যঙ্গ করবেন না দয়াকরে। ওরাও আমার আপনার মতোই মানুষ। একটি শিশুর সেক্স ক্রোমোজোম কি হবে, তা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। হয়ত আমি বা আপনিও প্রকৃতির এই খেয়ালী আচরণে তাঁদেরই মতো হয়ে জন্মাতে পারতাম অথবা আমার আপনার বাচ্চাও তাঁদের মতো সেক্স ক্রোমোজোমের ত্রুটি নিয়ে জন্মাতে পারে। অন্তত্য এই কথা চিন্তা করে হলেও এই মানুষগুলোকে অবহেলা, হেও বা অপমাণ বা ব্যঙ্গবিদ্রুপ করবেন না। মনের গহীনে ধারণ ও লালন করা লিঙ্গ, বর্ণ, জাতপাত, ধর্মের বৈষম্য ঝেড়ে ফেলে মানুষ হিসেবে হোন মানবিক মানুষ।

"হিন্দুর ডিগ্রি ইত্যাদি গণনা, শুভ অশুভ দিনের মতবাদ, কতকগুলি মধ্যযুগীয় ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত হিন্দুপঞ্জিকা একটা কুসংস্কারের বিশ্বকোষ মাত্র।"

-মেঘনাদ সাহা

পূজা প্রার্থনা বা নামাজ পড়ে কি পৃথিবীর কোন ব্যক্তির, গোষ্ঠীর বা দেশের উন্নতি হয়েছে?

-শম্ভুনাথ চার্বাক

পূজা প্রার্থনা বা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে কি পৃথিবীর কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা দেশের উন্নতি হয়েছে? এর প্রমাণ কি কেউ দিতে পারবে? অনেককে দেখেছি সারা জীবন ভক্তিভরে নিয়ম মেনে পূজা আর্চা করার পর শেষ জীবনে প্রায় ছয় মাস কোমাতে থেকে মারা যেতে। আবার একজন মুসলিম ভদ্রলোককে দেখতাম নিয়ম করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পর একদিন ট্রাক চাপা পড়ে হাসপাতালে দুর্বিসহ অবস্থায় কদিন কাটিয়ে মারা গেছেন। তার ছেলে কলকাতার হাসপাতালে তার সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে ভিড় ট্রেনের থেকে পড়ে মারা যায়। তাহলে প্রার্থনার ফল কি?

আমাদের ছোটবেলায় মা বাড়িতে বিপদতাড়িনি ও বিপিনাশিনীর পুজো করতেন প্রতি আষাঢ় মাসে, এছাড়াও নানান ব্রত করতেন। কিন্তু মা মাত্র ৬৬ বছর বয়সে প্রচুর রোগে ভুগে মারা গিয়েছিলেন।পুজো করে কি আদৌ কোন ফল হয় বা হয়েছে? কোনো বিপদ কেটেছে? আসলে ভগবান থাকেন ধনীদের গৃহে; সেখানে ধনীর সম্পদ বাড়ান গুনিতক হারে। আদানি আম্বানি বিড়লা --------- প্রভৃতিদের দেখুন। ওরা পুজো নামাজ প্রেয়ারে সাধারণ মানুষকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। এতে ওদের দুদিক থেকেই লাভ হয়। একদিকে নিজের দ্রব্য বিক্রি আর একদিকে শ্রমিকদের মধ্যেই ধর্মীয় বিভেদ তৈরী করে শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার আন্দোলন ভাঙ্গার জন্য। গরিব মধ্যবিত্তরা পুজো ঈদ বড়দিন বা অন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসবে যা খরচ করে তার সিংহ ভাগ ধনীদের কাছেই যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। নোয়াখালী দাঙ্গার পরেই ভয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মিরসরাই থেকে কলকাতায় সেটেল হয়ে আমাদের এতগুলি ভাইবোনকে মানুষ করতে করতে মা প্রচণ্ড লড়াই করে ক্ষয়ে গেছেন। দেশভাগে বিপর্যস্ত উদ্বাস্ত পরিবারকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে মা অনেকটা দায়িত্ব নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে গেছেন। উদ্বাস্ত না হলে উদ্বাস্ত শব্দের অর্থ পরিস্ফুট হয়না। আমাদের জীবনে যা কিছু হয়েছে মায়ের অবদান তাতে সিংহভাগ; বাবা সেই অর্থে সংসার সন্যাসী, সমস্ত ব্যাপারেই উদাসীন এবং ঠাকুর দেবতা নিয়ে বেশ একটু নির্বিকারই ছিলেন । মা সংসার নিবেদিত প্রাণ ছিলেন ফলে চরম অনিযম করে মা মাঝে মাঝে অসুস্থ হতেন, হাসপাতালে ভর্তি হতেন। কোনোদিন পুরো সুস্থ ছিলেন না। কিন্তু প্রতি আষাঢ় মাসের মঙ্গল ও শনিবার পুরোহিত ডেকে পুজো করতেন ভক্তিভরে এবং লাল কালো তাগাতে হাত ভরে থাকতো, শুধু তাই নয় বাড়িতে মনসা লক্ষ্মী কার্তিক সরস্বতী সূর্য পূজা এবং আরো অনেক ব্রত হতো। তাবিজ কবজ মাদুলিও কম করেননি। কিন্তু মায়ের কোন বিপদ কাটেনি বা বিপদ নাশ হয়নি। আবার অসুস্থ হলে মন্দিরেও হত্যে দিতে যাননি, বারেবার হাসপাতালেই গিয়েছিলেন। এইসব দেখে ছোটবেলা থেকেই আমার বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছিল। মা আবার দেওয়ানগাজি এলাকার পীরের থানেও প্রদীপ জ্বালাতেন, ফল কি? শূন্য ঋণাত্মক। আমি বলতাম কবজ তাবিজ মাদুলি বিপদতাড়িনীর তাগা পরেও তোমার বিপদ কাটছেনা; ওসব ছেড়ে দাও। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে অবশ্য সব পূজা আর্চা কবজ মাদুলি তাগা বাদ দিয়েছিলেন এবং আমাদের বাড়ি সর্বধর্মের বন্ধুদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। আসলে এই রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় মানুষের জীবন বিপর্যস্ত এবং ভয় অনিশ্চয় ও সংশয়ে ভরা। সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মানুষের নিদারুণ অসহায় অবস্থা মানুষকে দুর্বল করে দেয় ফলে বিশ্বাস ভয় মাথায় চড়ে বসে এবং সেই ভয় থেকেই ভক্তি তৈরি হয় এবং তারপর ঐ ভক্তিকে কেন্দ্র করে শুরু হয় পূজার নামাজের ব্যবসা।গড়ে ওঠে মন্দির মসজিদ গির্জা, তৈরি হয় পুরুত ইমাম পাদ্রী। আসে রাজনীতি এবং ধর্ম ও রাজনীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, মানুষের জীবনকে করে তোলে দুর্বিসহ।

প্রতিটি ধর্ম তৈরির সময় সমাজ ছিল অস্থির অভাবে ভরা এবং মানুষের জ্ঞানও ছিল একদম আদিম স্তরে। প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভয় থেকেই চিন্তা করতে পারা একমাত্র জীব মানুষের ধর্ম জন্ম নিয়েছে । প্রকৃতির আর কোন জীব ধর্মপালন করেনা; সুন্দরবনে হিন্দু বাঘ বা মুসলিম শুয়োর বা খ্রিস্টান হাতি দেখেছেন??। ধর্ম আবিষ্কারের পরেই এটাকে নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে বুদ্ধিমান মানুষের দ্বারা । সবাই নিজের লোক বাড়াতে চেয়েছে ভয় অথবে অস্ত্রের জোরে। মুহাম্মদের মদিনার জীবনী রাজনীতি ছাড়া কি?? রাজানুগ্রহ না পেলে কোনো ধর্মই এমনভাবে প্রসারিত হতোনা । সম্রাট অশোকের সহায়তা না পেলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ হতোনা। গুপ্ত রাজাদের সহায়তা না পেলে হিন্দু ধর্মও পুন:প্রতিষ্ঠা করা মুশকিল ছিল। সব ধর্মের ইতিহাসই প্রায় এক এবং ধর্মগ্রন্থগুলি রূপকথা ভয় লোভ দেখানো ঘৃণা হিংসায় ভরা রক্তাক্ত। আমিই ঘোর নাস্তিক বোধহয় ভারতের প্রায় সব রাজ্যের অধিকাংশ বড় বড় তীর্থস্থানে ঘুরেছি একফোটা ধর্ম বিশ্বাস না নিয়ে । তবে

ভারতের নামী তীর্থস্থান গুলি প্রকৃতির অপূর্ব জায়গায় স্থাপিত; অমরনাথ কেদার বদ্রী গঙ্গোত্রী মণিমহেশ হেমকুণ্ড গোয়ার কিছু গির্জা বা কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ ---সবের পথের শোভা অসাধারণ। সেই পথের সৌন্দর্যের টানেই ছুটে যাই; দেব দেবীর টানে নয় । কোনো মন্দির মসজিদ গির্জায় বিশেষ স্থাপত্য না থাকলে সাধারণত ঢুকিনা। যারা প্রচুর পূজা আর্চা করে তাদের অধিকাংশই গ্রাম ছেড়ে বেরোতে পারেননি।যারা বেশী পূজা করে বেশী নামাজ পড়ে তাদের দেখেছি অধিকাংশই অসৎ । আবার পাড়ায় অনেককে দেখেছি যারা সারা জীবন ধরে পুজো আর্চা নিয়ে আছে এবং সৎ জীবনযাপন করে তারা গরীব খেতে পায়না এবং তারা কোনোদিন গ্রামের বাইরে বেরোতে পারেনি। তাহলে এই পূজা প্রার্থনার নীটফল কি শূন্য নয়??

কোন ধর্ম পালন না করেও মানুষ সৎ ভাবে বাচতে পারে । অনেক লোককে দেখেছি ধর্মের ধ ও মাথায় না তারা ভীষণ সৎ। আমি কোন ধর্মেই বিশ্বাস করিনা এবং ধার্মিকদের সঙ্গ এড়াই ও পারলে বিরোধীতা করি। বাষট্টি বছর পর্যন্ত লড়াই করে বেঁচে আছি এবং ভালোই বেঁচেছি, অন্যদের থেকে খুব একটা খারাপও নেই। রোগের কথা যদি বলেন তবে বলব যারা প্রচুরপূজা আর্চা করে তাদের ঘরে টিভি ক্যান্সার হয় কেন??। প্রকৃতির সৃষ্ট মানুষ আমি প্রকৃতি প্রদত্ত হাত পা মগজ দিয়ে আমার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। চেষ্টা করি সবার পাশে থাকার আর কি? এভাবে চলে গেলেই হয়।

"ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই শাস্ত্রের অ্যালকোহল পান করিয়াছে।"

-কাজী নজরুল ইসলাম

হেরোফিলোস ও ইরাসসিস্ট্রাস

-শ্যামল

মরণোত্তর দেহদানের কথা জানতে গেলে হেরোফিলাস ও ইরাসসিস্ট্রাস এই দুই জনের কথা জানতেই হবে। ইরাসিস্ট্রেটাস এবং হেরোফিলাস এই দুই জনই একমাত্র চিকিৎসক যারা রেনেসাঁর আগে নিয়মিতভাবে মানবদেহে ব্যবচ্ছেদ করতেন। এই সবই শুরু হয়েছিল ৩য় শতাব্দীর প্রাচীন গ্রীসে কালসিডনের হেরোফিলাস এবং সিওসের ইরাসিস্ট্রেটাস নামের দুই চিকিৎসকের হাত ধরে।

হিরোফিলোস প্রথম বিজ্ঞানী যিনি নিয়মিতভাবে শবদেহের বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তিনি মানব দেহকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মস্তিষ্কে স্নায়ুর কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং রক্তের বাহন, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ, চোখ ইত্যাদি বর্ণনা করেন, পদ্ধতিগত শারীরিক গঠন শুরু হয়। এছাড়াও তিনি চোখ, লিভার, লালা গ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় এবং উভয় লিঙ্গের যৌনাঙ্গে অঙ্গগুলির যত্ন সহকারে বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বইয়ে মিডওয়াইফারি, তিনি পর্যায়ক্রমে এবং গর্ভাবস্থার সময়কালের পাশাপাশি অসুবিধাজনিত প্রসবের কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই কাজের উদ্দেশ্য হ'ল ধাত্রী এবং সেই সময়ের অন্যান্য ডাক্তারদের জন্মানো এবং গর্ভাবস্থার প্রক্রিয়া আরও পুরোপুরি বুঝতে। এটি আবিষ্কারের জন্যও কৃতিত্বপ্রাপ্ত ডিম্বাশয় এবং পরে যাকে বলা হবে তার বৈজ্ঞানিক বিবরণ দিয়েছিলেন স্কিনের গ্রন্থি। ২০০১ সালে এর নামকরণ করা হয় মহিলা প্রোস্টেট। হিরোফিলাস তাঁর গবেষণা নিয়ে কমপক্ষে নয়টি রচনা লিখেছেন। ৩৩৫ খ্রীষ্ট্র পূর্বাব্দে হেরোফিলোস জন্মগ্রহণ করেছিলেন এশিয়া মাইনরের চালসিডন শহরে (এখন কাদিক্য, তুরস্ক)। তিনি তার স্কুল জীবন শুরু করার জন্য মোটামুটি অল্প বয়সে আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে এসেছিলেন বলে তার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি।

এবার জানা যাক ইরাসিস্ট্রেটাসের কথায়। ইরসিস্ট্রাটাস তাঁর সমসাময়িক ছিলেন যিনি হেরোফিলাসের সাথে যৌথভাবে এই শবদেহ ব্যবচ্ছেদের কাজ করেছেন। একসাথে তারা আলেকজান্দ্রিয়াতে একটি মেডিকেল স্কুলে কাজ করেছিলেন। তাঁরা এখানে মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ অনুশীলন করতেন এবং যা ছিল শারীরবিদ্যা শেখার প্রধান মাধ্যম। ইরাসিস্ট্রেটাস হৃৎপিণ্ডের ভালভের বর্ণনার জন্য তাকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়, এবং তিনি আরও উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে হৃদয় সংবেদনের কেন্দ্র ছিল না, বরং এটি একটি পাম্প হিসাবে কাজ করে। ইরাসিস্ট্রেটাস শিরা এবং ধমনীর মধ্যে পার্থক্যকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন।



ইরাসিস্ট্রাটাসকে হেরোফিলাসের পাশাপাশি রেকর্ডকৃত ব্যবচ্ছেদ এবং সম্ভাব্য ভাইভিসেকশন পরিচালনা করা প্রথম চিকিৎসক/ বিজ্ঞানীদের একজন হিসাবে দেখা হয়। ভাইভিসেকশন হল কোন জীবন্ত প্রাণীর উপর পরীক্ষামূলক উদ্দেশ্যে পরিচালিত অস্ত্রোপচার, সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রাণী, জীবিত অভ্যন্তরীণ গঠন দেখতে। এই দুই জনের মৃত্যুর পর শারীরবিদ্যা সম্পর্কিত ব্যবচ্ছেদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং সর্বক্ষেত্রে এর ব্যবহার শুরু না হওয়ার আগ পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে। ১২ শতকের পূর্বে এটি আর পুনরুজ্জীবিত হয়নি।

এইখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ করতেই হচ্ছে। ১২শ শতকের দিকে মানুষের মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ আবারও শুরু হয়েছিল। এবারও ব্যবচ্ছেদকে অসম্মানের চোখে দেখা হয়েছিল, তবে এটাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয় নি। তার পরিবর্তে, নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং এগুলোর অনুমতির ব্যাপার গির্জা নির্দিষ্ট কয়েকটি ফরমান সামনে নিয়ে আসে। এই ফরমানগুলোর একটি যা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য স্মারকরূপে গণ্য হয়েছিল তা হচ্ছে পবিত্র রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক কর্তৃক ১২৩১ সালে জারিকৃত একটি ফরমান। এই ডিক্রিতে বলা হয়েছিল যে, শারীরবৃত্তীয় অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে প্রতি পাঁচ বছরে একটি মানবদেহ একবার ব্যবচ্ছেদ করা হবে এবং যারা চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন অথবা ঐ সময়ে এই বিষয় দুটি নিয়ে অনুশীলন করছেন তাদের সকলের উপস্থিতি প্রয়োজন। ১৭ শতকে এটি উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তখন থেকে আজও এর ব্যবহার করা হয়ে চলেছে।

মুফতি সাহেবের সাথে যুক্তি-তর্ক

-আব্দুল হালিম বিশ্বাস

গত রবিবার একটি পরিবেশ বিষয়ক সেমিনারে উপস্থিত ছিলাম। সেমিনার শেষে দেখলাম ঐ মঞ্চে একজন নববধূ ও একজন সাংবাদিক অতি সহজে মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করলেন। অতি সহজে কথাটি এই কারণে ব্যবহার করলাম, যে সমাজে আমি বড়ো হয়েছি সেখানে মরণোত্তর দেহদান শুধু কঠিনই নয় প্রায় অসম্ভব।

মরণোত্তর দেহদানের উপকারিতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি মনের মধ্যে অনুরণন হচ্ছিল। পরদিন সকালেই একজন মুফতি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি স্থানীয় একটি খারিজি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকও।

আমি: মুফতি সাহেব, ইসলামে মরণোত্তর দেহদান প্রসঙ্গে বক্তব্য কি?

মুফতি সাহেব: না, একদম জায়েজ নয়।

আমি: কেন নয়, ধরুন আমি মৃত্যুর পর চক্ষু দান করব। তাতে তো একজনের অন্ধত্ব দূর হতে পারে।

মুফতি সাহেব: দান করুন। জীবিত অবস্থায় করুন। কোনো বাধা নাই। অনেকেই তো কিডনি দান করে।

আমি: জীবিত অবস্থায় আমি দুচক্ষু ব্যবহার করলাম। মৃত্যুর পরে কর্ণিয়া দান করলাম। তাতে তো আমার ক্ষতি নাই, বরং অপর একজনের উপকার আছে।

মুফতি সাহেব: এত ইচ্ছে হলে এখনই করুন। মৃত্যুর পরে অনুমতি নাই।

আমি: কিন্তু কারণটা কি? কেন দিতে পারব না?

মুফতি সাহেব: মৃত্যুর পর লাশের কাটাছেঁড়া করলে লাশের অসম্মান হয়। কাটাছেঁড়া করা যাবে না।

আমি: আমার তো মনে হয় তাতে লাশের সম্মান বাড়ে। জীবিত অবস্থায় যা পারলাম করলাম। মৃত্যুর পরে অন্তত একজনের জীবনে উপকার করতে পারলাম।

মুফতি সাহেব: এটা বোঝার ভুল। ইহকালের থেকে পরকালই দীর্ঘস্থায়ী না?

বস্তুতঃ মুসলিম সমাজ তথা ইসলামিক বিশ্বের এটাই গোড়ার কথা। অর্থাৎ মৌলবী মৌলানা সাহেবদের ভাষায় ইহকাল হলো "দুদিনের দুনিয়াদারি"। একজন একনিষ্ঠ মুসলমানের ভাবনা চিন্তা কর্ম শ্রম সবই পরকালের জন্য। আরও ঠিক ঠিক বলতে গেলে জান্নাত হুর গেলেমান প্রভৃতির জন্য। সেখানে এই পৃথিবীর সুখ শান্তি আনন্দ বেদনা সবই তুচ্ছ। আর তাই, পৃথিবীতে শিক্ষা সংস্কৃতি প্রযুক্তি উদ্ভাবনা প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়েছে।

আমি: তাছাড়া, মুফতি সাহেব, মৃত ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ছাড়াও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অ্যানাটমি বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের অধ্যায়ন ও হাতে কলমে শিক্ষার জন্য মৃত দেহ প্রয়োজন। তার জন্য আমাদের মরণোত্তর দেহদান করা উচিত।

মুফতি সাহেব: জীবিত অবস্থায় মানুষের হাড়গোড় ভাঙাচোরা করলে যেমন কষ্ট পায়, কাটাছেঁড়া করলে লাশও কষ্ট পায়। ওটা করা যাবে না।

আমি: তাহলে দেশে ইসলামিক বিধান চালু হলে কোনো ছাত্রছাত্রী হাতেনাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারবে না। বড়ো মানের সার্জেন দেশে তৈরি হবে না। এইভাবে ইসলামিক বিধিনিষেধের কারণেই কি ইসলামিক দেশগুলো চিকিৎসা বিজ্ঞানে পিছিয়ে যাবে না?

মুফতি সাহেব: কি হবে তাতে? সবচেয়ে বড় সার্জেন তো আল্লা স্বয়ং। ইসলামের দলিল তো পাল্টানো যায় না।

মরণোত্তর দেহদানে ইসলামিক প্রতিবন্ধকতার প্রতিফলন আরব ভুখন্ডে লক্ষ্য করা যায়। সৌদি আরবের প্রায় সকল হাসপাতালে নামী ডাক্তার বা সার্জেন বলতেই ভারতীয় অথবা ইউরোপীয়। আরব সন্তানদের বড়ো একটা দেখা যায় না। কয়েকজন ডাক্তারের যে নাম পাওয়া যায় প্রত্যেকেই ইউরোপ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত।

তবে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিশরের মতো মুসলমান প্রধান দেশগুলো মরণোত্তর দেহদানকে উৎসাহিত করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানও প্রভূত উন্নত। এবং উন্নতির জয়যাত্রায় ধর্মের বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

কয়েক বছর আগে দিল্লির একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মরণোত্তর দেহদানের প্রচার চালালে অঙ্গীকারবদ্ধদের তালিকায় দেখা যায় একশো শতাংশ দাতাই অমুসলিম। এবং অতি আশ্চর্যের, ঐ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অপর একটি রিপোর্টে দেখা যায়, পূর্বে প্রতিস্থাপিত অঙ্গ গ্রহীতার পঁয়তাল্লিশ শতাংশই মুসলিম।

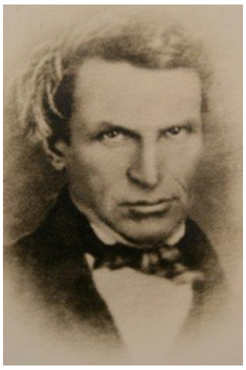
অর্থাৎ লাশের অঙ্গ, জীবনের জন্য গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ধর্মের বিধিনিষেধে দান করা যায় না। এই স্বার্থপরতা বড়ো একমুখী, দৃষ্টিকটু। ভারতবর্ষের মতো বহুধর্মের দেশে বড্ড বেমানান। দান সকল সমাজেই শ্রেষ্ঠ, সে দেহ হোক বা ধনসম্পদ হোক। আমাদের মনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করতে হবে। তাতে ধর্মের বেড়া ভেঙে গেলে যাক।

"কুড়াল কহিল, ভিক্ষা মাগি ওগো শাল, হাতল নাহিকো, দাও একখানি ডাল।
ডাল নিয়ে হাতল প্রস্তুত হল যেই, তার পরে ভিক্ষুকের চাওয়া-চিন্তা নেই—
একেবারে গোড়া ঘেঁষে লাগাইল কোপ, শাল বেচারার হল আদি অন্ত লোপ।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাষ্ট্রনীতি)

মরণোত্তর দেহদানের প্রথম প্রচারক

-শ্যামল



এই মানুষটির কথা জানতে গেলে ইতিহাসের পাতা ওলটাতে হবে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দতে লন্ডন এবং তার আশেপাশে বেসরকারি মেডিকেল স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এসব স্কুলের জনপ্রিয়তার কারণ ছিল মূলত সত্যিকার মানবদেহ ব্যবচ্ছেদের সুযোগ। কিন্তু সমস্যা হলো সে সময় সবার মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের অনুমতি ছিল না। কেবল মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের দেহই সরকারি মেডিকেল স্কুলগুলোতে দেয়া হতো। কিন্তু তা খুব সহজ ছিল না। সেইখানেও নানা ধরণের বাধা বিপত্তি ছিল। ১৭৬৫ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত ডাক্তার ও মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ওপর প্রায় ২৫টি হামলার ঘটনা ঘটে। হামলা থেকে বাদ যায়নি মেরিল্যান্ড কিংবা ইয়েলের মতো নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও। ফলে বাধ্য হয়েই এনাটমির শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা বেছে নেন এক অবৈধ পথ। সেই সঙ্গে রচিত হয় অন্ধকার জগতের নতুন অধ্যায়, শব বাণিজ্য। শুরু হয় কবর থেকে চুরি। ১৭৭০ সালে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক জন ওয়ারেন "Spunkers" নামে একটি গুপ্ত এনাটমি সোসাইটি তৈরি করেন, যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মৃতদেহ সংগ্রহ করে ব্যবচ্ছেদ করতেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতেও অবস্থার সামাল দেওয়া যায় নি। চুরি করা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা ছিল বেআইনি। এই অপরাধে ১৮২৪ সালে ডা. চার্লস নলটন (Charles Knowlton) অবৈধ ব্যবচ্ছেদের দায়ে গ্রেফতার হন। দু'মাস পর ছাড়া পেয়ে তিনি জনগণের মধ্যে মরণোত্তর দেহদানের বিষয়ে কুসংস্কার দূর করার জন্য ডাক্তারদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই চার্লস নলটনই (নাউলটন) ছিলেন প্রথম মরণোত্তর দেহদানের প্রচারক। কিন্তু এই প্রচারে কোন সাড়াই মেলে নি। কিন্তু তিনি থেমে থাকেন নি। জেলে থাকাকালীন তার কিছু উপলব্ধি হয় এবং তিনি মরণোত্তর দেহদানে যে কুসংস্কার তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি বই লেখেন

“Elements of Modern Materialism”। যা ১৮২৯ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৮৩২ সালে মরণোত্তর দেহদানের আইন ইংল্যাণ্ডে প্রবর্তন হয়। এই সালেই ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ জেরেমি বেন্থামের মৃতদেহ দান দিয়েই মরণোত্তর দেহদানের যাত্রা শুরু।

পরিশেষে জানাই, চার্লস নলটন (নাউলটন) ছিলেন আমেরিকান। ১৮০০ সালের ১০ ইউনাইটেড স্টেটের ম্যাসাচুসেটসের টেম্পেল্টনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫০ সালে ম্যাসাচুসেটসের উইনচেনডনে মারা যান।

"নাস্তিক হওয়া সহজ নয়। এ এক অনন্য শক্তিধর অভিব্যক্তি। কেননা বিশেষ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও প্রবল মনোবল না থাকলে নাস্তিক হওয়া যায় না। আশৈশব লালিত অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় কুসংস্কার, আচার-আচরণ, রীতিনীতি পরিহার করা সাধারণের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবলমাত্র অসামান্য নৈতিক শক্তিধর যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই তা সহজ।"

-ড. আহমদ শরীফ

প্রতিটা মানুষই স্বভাবগতভাবে কম বেশি নাস্তিক

-শোভন নস্কর

প্রতিটা মানুষই স্বভাবগতভাবে কম বেশি নাস্তিক। পুরোপুরি আস্তিক মানে সে বদ্ধপাগল। কি হলো কানে হাত চেপে মনে হচ্ছে, ইসস কি শুনলাম! আমি নাস্তিক হলাম কিভাবে! হ্যাঁ, মন্দিরে ঘন্টা বাজানো পুরোহিত থেকে মসজিদের ইমাম পর্যন্ত সবাই নাস্তিক! কিন্তু তাহলে নিজেদের নাস্তিক না বলে ঘোর ঈশ্বর বিশ্বাসী বলে কেন? আসলে সমাজের চাপানো ক্রমাগত মিথ্যার আস্তরণের চাদর ভেদ করে উঠতে পারেনা। প্রতিটা মানুষ নিজেকে বোঝায় সে আস্তিক, যদিও সে না। জীবনের বহু এমন ক্ষণিকের সিচুয়েশন তৈরি হয় যেখানে সে ইশ্বরকে অবিশ্বাস করে ফেলে!

একজন সাধারণ মানুষকে কিভাবে নাস্তিক প্রমাণ করবেন? খুব সোজা, কিছু টাকা ধার নিয়ে বলুন, পরকালে টাকা শোধ করে দেবো। কারোর ক্ষতি করে বলুন, ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দেবে, আপনি দয়া করে পুলিশে যাবেন না! কারোর মুখ থেকে মাস্ক সরিয়ে বলুন, চলুন মন্দিরের ভীড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মুসলমানদের সভায় বড় বড় করোনা তাড়ানো হুজুররাও জানে করোনার সময় মক্কা বন্ধ রাখতে হয়। কোটি কোটি মানুষের প্রবলেম চুটকিতে সলভ করে দেওয়া তিরুপতি মন্দিরও বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে কি ওই ইমাম বা পুরোহিতগুলো ঈশ্বরের ভরসায় ওগুলো কি খুলে রাখতে পারতো না? হু হু বাওবা! খেল তো ওখানেই। প্রতিটা মানুষ জানে গীতা বা কোরানের কোন নিয়মই বর্তমান জীবনে মেনে চলা সম্ভব নয়। 'যাহা গেছে তাহা যাবে ', 'যা হয় সবই ভালোর জন্য' ঘোর ধর্মবিশ্বাসী মানুষের কাছ থেকে এক লাখটাকা চুরি করে এইসব ডায়লগ ঝেড়ে আসুন তো! পিটিয়ে সোজা করে দেবে।

হাজার হাজার কট্টর ধর্মবিশ্বাসী যারা অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করে না, বিপদে পড়লে সুড় সুড় করে বেজাতের ডাক্তার দেখাতে দ্বিধাবোধ করবে না। মন্দির মসজিদে পড়ে থাকার থেকে বেজাতের ডাক্তারকে তখন শ্রেয় মনে করে।

এখন প্রশ্ন আসতেই পারে, মানুষ যদি নাস্তিকই হয় তাহলে আস্তিকতার মুখোশ পরে থাকে কি করে? কারণটা খুবই সোজা। মানুষ দলবদ্ধপ্রানী। প্রাচীনকাল থেকে নানা গোষ্ঠী তৈরি করে গেছে। তার থেকে হয়েছে গোষ্ঠী দন্দ্ব। ক্রমাগত একে অপরের থেকে উঁচু, এটা বোঝাতে নিজেদের গোষ্ঠীকে বড় করে গেছে। সেটা এখনো করে যাচ্ছে এবং যেটা করার দায়িত্ব নিয়েছে ধর্মগুরু, বলা যেতে পারে ধর্মব্যবসায়ীরা। তারা ঘোষিত নাস্তিকের থেকেও বড় নাস্তিক। কাল্পনিক ঈশ্বর এবং তার গুনকীর্তন করে গোষ্ঠীবৃদ্ধিই তার কাজ।

> “মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। মহাবিশ্ব পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মনীতি অনুযায়ী স্বতস্ফুর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের আমদানি একেবারে হাস্যকর”
>
> -স্টিফেন হকিং

ভারতীয় ইতিহাসের আরব্যকরণ এবং রাজনীতি

- সৌরাষ্ট্র দাশ

একটি মিথ্যা ও ভ্রান্ত ইতিহাস বর্তমানের social media তে দেখা যায়। [1] ভারতকে স্বাধীন করতে যদি দশজন হিন্দু প্রাণ দিয়ে থাকে তাহলে ৯০ জন মু সলমান প্রাণ দিয়েছিলো। এই ইতিহাস নাকি বিজেপি আরএসএস মুছে ফেলেছে! অথচ মুসলিম লীগের অন্যতম লিডার, সাংবাদিক, লেখক আবুল মনসুর আহমদ তার বিখ্যাত বই ['আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'] বইতে লিখেছেন, [2] মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতা চায়নি। তাদের মূল আগ্রহ ছিলো তুর্কী খিলাফত নিয়ে। সেই খিলাফত ও তার খলিফাকে রক্ষার জন্যই তারা মহাত্মা গান্ধির সমর্থন পাওয়ার আশ্বাসে অসহোযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো। পরে খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে গেলে সেই ভাবে মুসলিমদের আর আগ্রহ দেখা যায়নি ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে...।

আবুল মনসুর আহমদ আত্মসমালোচনা করে এই স্বীকারোক্তি করেছিলেন যে, মুসলিম লীগের একজনও তারা ভারতের স্বাধীনতা চায়নি! আজকের বুর্জোয়া কমিউনিস্টরাই 'ওহাবী আন্দোলনের' নাম দিয়েছিলো 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'! তীতুমীরের মত একটা ইসলামিক মৌলবাদী কে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' হিসেবে সবার কাছে পরিচিত করতে চেয়েছে। কিন্ত কাল মার্ক্স তার বই - [3] [MARX NOTES ON INDIAN HISTORY] তে লিখেছেন -Also, formidable disturbance at Barasat, near Calcutta, where bloody fight broke out between Moslem fanatics under Titu Mir and Hindus. British regiment put the rioters down (p.129) এর পরেও আজকের বুর্জোয়া রা কাল মার্ক্সকে চাড্ডি বলতে দুই পা পিছু হবে না।

হাজি শরীয়তুল্লাহ-তীতুমীর-দুদুমিয়ারা এই বঙ্গে হিন্দুয়ানী বিরোধী আন্দোলন করে বাঙালি মুসলমানকে তাদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যতা তৈরির আন্দোলন ছিলো ওহাবী আন্দোলন। আজকে যাদের সালাফি বা আহলে হাদিস হিসেবে চেনে তীতুমীর-শরীয়তুল্লাহ ছিলেন সেই মতবাদের আদিপুরুষ। তাদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে আমাদের সামনে পরিচিত করেছে এই বুর্জোয়া বামগুলি। তাদের ছানাপোনারা যখন আমাদের ইসলাম শেখাতে আসে, ইতিহাস শেখাতে আসে, বিজেপি আরএসএসের ইতিহাস বলে সত্যকে মুছে ফেলে তখন ভারতের হিন্দুদের কপালে দুঃখ আছে বলতেই হবে!

এইসব বামদের কাছে প্রশ্ন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'বেঙ্গল প্যাক্ট' কেন করেছিলেন যদি হিন্দু মুসলমান একই বৃন্তের দুটি কুসুম হয়ে থাকবে? নিরোদ সি চৌধুরী দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার ইতিহাস অনেক পুরোনো। সাতশো বছরের মুসলিম শাসনে স্থানীয় হিন্দুদের উপর মুসলিমদের একেশ্বরবাদ, তাদের কালচার, শাসক হিসেবে, ধর্মগুরু হিসেবে যে আধিপত্য চলেছে সেখানে কি করে সুসম্পর্ক তৈরি হবে? যে মুসলমানরা মনে করত ইংরেজ তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে সেই ক্ষমতা নিজের হাতে শাসক হিসেবে বুঝে পাওয়াই লক্ষ্য সেই জনগোষ্ঠি কি করে হিন্দুদের ভাই মনে করবে? এরা তো হিন্দুদের প্রজাই মনে করবে। হিন্দু কমিউনিস্টদের মুখে ঝামা ঘষে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন।

[5] মুসলমানরা নিজেদের জন্য পদ পদবী পাওয়ার বিষয়ে আগ্রহী ছিলো। বেঙ্গল প্যাক্ট করতে তাদের আগ্রহ ছিলো বিপুল কারণ এখানে রাজনীতি ও সরকারী চাকরিতে লোভনীয় কোঠা সুবিধার চুক্তির কথা বলা হয়। সেই মোতাবেক দেশবন্ধু যখন কোলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন তখন তার ডেপুটি করা হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। বেঙ্গল প্যাক্ট আদৌ হিন্দু মু সলমান ঐক্য নয় বরং বিবাদমান দুটি শত্রুর মাঝে শান্তি চুক্তি হচ্ছে বলেই মনে হয়। বস্তুত এরকম চুক্তি করে কখনোই ঐক্য করা সম্ভব নয়। বেঙ্গল প্যাক্টের চুক্তির এই ধারাগুলির দিকে একটু তাকান-

রাজনীতির পঞ্চাশ বছর - বই থেকে একটি পেজ পুরোটাই তুলে দিলাম। (p.162,163)

[6] কমরেড এম. এন. রায়ের প্রভাব জিন্না - সুভাষ মোলাকাত ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তার একটা ছাপ আমার মনে স্থায়ী হইয়াছিল। আমি নয়া ধারায় চিন্তা করিতে শুরু করি। এই চিন্তায় কমরেড এম. এন. রায়ের সাহচর্য আমাকে অনেক দূর আগাইয়া নিয়া যায়। ১৯৩৮ সালে দিল্লী কংগ্রেস কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে কমরেড রায়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তার আগে কমরেড রায়ের প্রতি আমার ভক্তি - শ্রদ্ধা ছিল নিতান্ত রোমান্টিক। বিশ্ব কমিউনিয়মের অন্যতম নেতা স্ট্যালিনের সহকর্মী হিসাবে তিনি ছিলেন আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে এক মনীষী। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর আমার ভক্তির রোমান্টিক দিকটার অবসান হইলেও শ্রদ্ধা - ভক্তি এতটুকু কমে নাই। বরঞ্চ বাড়িয়াছে। বাস্তব রাজনীতিতে অবশ্য তাঁর মতবাদ ও উপদেশ নির্ভরযোগ্য মনে করিতাম না। সক্রিয় রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর মত ধৈর্য ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় প্রথম দিকে তিনি আমাকে কৃষক - প্রজা

পার্টি ভাংগিয়া সমস্ত কর্মীদের লইয়া সদলবলে কংগ্রেসে যোগ দিবার পরামর্শ দেন। তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য করার পর তিনি নিজেই কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং আমরা কৃষক - প্রজা কর্মীরা কংগ্রেসে না যাওয়ায় আমাদের প্রশংসা করেন। কলিকাতার মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে আহুত মুসলিম ইনস্টিটিউটের এক সভায় তিনি কংগ্রেসকে ' নিমজ্জমান নৌকা ' বলেন এবং উহা হইতে সাঁতরাইয়া পার হওয়ার জন্য দেশ - প্রেমিকদের অনুরোধ করেন। কিন্তু আদর্শগত দিক হইতে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত আমাকে বিস্মিত ও মোহিত করিয়াছিল। কংগ্রেস - মুসলিম লীগ - কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক প্রজা পার্টির প্রভাবে ভারতের সকল গণ - প্রতিষ্ঠান যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিতেছিলেন, তখন কমরেড রায় একাই ফ্যাসি - নাযিবাদকে মানবতার শত্রু ও সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে বড় দুশমন প্রমাণ করেন এবং এই যুদ্ধকে গণযুদ্ধ বা ' পিপলস ওয়ার ' আখ্যা দেন। বিশ্বের একমাত্র সমাজবাদী রাষ্ট্র রাশিয়া হিটলারের সমর্থন করায় আমরা কমরেড রায়ের কথায় তখন বিশ্বাস করি নাই। তাঁর উপদেশ মানি নাই। পরে ১৯৪১ সালের জুন মাসে যখন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন এবং রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়, তখন কমরেড রায়ের কথার সত্যতায় এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় আমার শ্রদ্ধা আকাশচুনী হইয়া গেল।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কৃষক - প্রজা সমিতির সেক্রেটারি ও আইন পরিষদে কৃষক - প্রজা পার্টির লীডার বন্ধুবর শামসুদ্দিন পদত্যাগ করার পর হক মন্ত্রিসভার সহিত কৃষক - প্রজা সমিতির সম্পর্ক আগের চেয়েও তিক্ত হইয়া পড়িল। ফলে আমার পক্ষে হক সাহেবের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যাতায়াত রক্ষা করাও আর সম্ভব রহিল না। ১৯৩৯ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বর ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভারতবাসীর বিনা অনুমতিতে ভারতবর্ষকে ইউরোপীয় যুদ্ধে জড়ানোর প্রতিবাদে সাতটি কংগ্রেসী প্রদেশ হইতেই কংগ্রেসী মন্ত্রী - সভারা ২২ শে ডিসেম্বর পদত্যাগ করিলেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগ পীরপুর রিপোর্ট নামে একটি রিপোর্টে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সমূহের মুসলমানদের উপর যুলুমের ফিরিস্তি প্রচার করিয়াছিল। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগকে মুসলিম লীগ কংগ্রেসী যুলুম হইতে মুসলমানদের নাজাত ঘোষণা করিয়া ২৩ শে ডিসেম্বর সারা ভারতে ‘ নাজাত দিবস ' পালন করে। এতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে এবং হিন্দু - মুসলিম সম্পর্ক আরও তিক্ত হইয়া পড়ে। এমন সাম্প্রদায়িক তিক্ততার মধ্যে কৃষক - প্রজা সমিতির অসাম্প্রদায়িক অর্থনীতিক রাজনীতি পরিচালন মুসলমান জনসাধারণ্যে খুবই কঠিন হইয়া পড়িল। তার উপর ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ' পাকিস্তান প্রস্তাব ' গৃহীত হওয়ায় এবং স্বয়ং হক সাহেবই সেই প্রস্তাব উত্থাপন ও তার সমর্থনে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও পাকিস্তান দাবির ও মুসলিম লীগের শক্তি শতগুণে বাড়িয়া গেল। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সভা - সমিতি ও প্রচার - প্রচারণা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ায় কৃষক - প্রজা সমিতির মত গরিব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সভা সম্মিলন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ফলে কৃষক - প্রজা সমিতির দাবিদাওয়া এবং হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রচার - প্রচারণা কেবল মাত্র সমিতির দৈনিক মুখপত্র ' ‘ কৃষকে’র পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ হইল।

এখানেই শেষ নয়। ভারত বিভাজন যোগেন্দ্রনাথ ও ডঃ আম্বেদকর। বই (p.65) সেই সময় হিন্দুদের নিয়ে মুসলিম লীগ কি চিন্তা করছে ভালো করে পড়ুন। আজ অব্দি পাকিস্তানের রাজনীতিতে হিন্দুদের কোনো স্থান নেই। এর পরেও ইতিহাস নিয়ে মিথ্যাচার চলে।

[7] “ পাকিস্তান হওয়ার বরং যুক্তি আছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা - সাম্যের সুযোগ দেওয়া মোটেও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আর অন্যান্য সংখ্যালঘুদের একত্রে চারটি আসনে সীমাবদ্ধ রাখাও আদৌ যুক্তিসংগত নয়। কারণ এঁদের (হিন্দুদের) মধ্যে একটি সম্প্রদায় হল তফসিলী যারা মুসলমানদের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশি কাষ্ট হিন্দুদের সঙ্গে তুলনায় মুসলমানদের সমান দাবি যদি যুক্তিযুক্ত হয় তবে তফসিলীদের পক্ষে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত প্রতিনিধিত্বের অন্ততঃ ৫০ ভাগ দাবি করা তো আরও যুক্তিযুক্ত। ”

[8] শুধু ভারত নয় সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সেদিন ডঃ আম্বেদকরকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সাধুবাদ জানাতে পারেনি লীগ, মিঃ জিন্নাহ্ এবং তাদের বন্ধু মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। মিঃ জিন্নাহ্ বলেছিলেন, ' আমরা পাকিস্তানের দাবি থেকে এক ইঞ্চিও সরছি না। ' শুধু তা - ই নয়, ঐ সময়ে এক ব্যক্তিগত আলোচনা প্রসঙ্গে আকালি নেতা সর্দার বলদেব সিংহকে সঙ্গে পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মিঃ জিন্নাহ্। তাঁকে বলেছিলেন: “বলদেব সিং, এই দেশলাই বাক্সটি দেখছেন তো! এই আকারের পাকিস্তানও যদি আমাকে দেওয়া হয়, আমি তা সানন্দে স্বীকার করে নেব। কিন্তু আমি আপনার সহায়তা - প্রার্থী। আপনি যদি শিখদের মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী করাতে পারেন তাহলে আমরা এমন এক গৌরবজনক পাকিস্তান পাব যার

দেউড়ি খাস দিল্লীতে যদি নাও হয় অন্ততঃ দিল্লীর কাছাকাছি হবে। ” শিখরা সেদিন মিঃ জিন্নাহ্র প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছিলেন তা ব্যাখা করার প্রয়োজন নেই। মিঃ জিন্নাহ্ যতদিন কংগ্রেসে ছিলেন ততদিন ধর্ম - বর্ণ - নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর নেতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে ইসলাম ভিত্তিক মুসলিম লীগে যোগদান করলেন যেদিন থেকে তাঁর চিন্তা - চেতনা ও নেতৃত্বের পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তিনি হলেন কেবল মাত্র লীগপন্থী মুসলমানদের নেতা। (p.66,67)
ভারত ভাগ ছিল একপক্ষ হিন্দুরা যতোটা ভারত ভাগের পক্ষে ছিল। তার থেকেও বেশি ছিল। সেই সময়ের মুসলিম সমাজ তারা গণতান্ত্রিক নয়। মনে মনে ইসলামিক রাষ্ট্রের কল্পনাই করেছিল। সেই বিষয় আর তথ্য প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। বর্তমানে সেই দেশে দলিত দের অবস্থা দেখছেন। আর তথ্য দরকার হলে ডঃ আম্বেদকর পাকিস্তান নিয়ে বইটা পড়তে পারেন। সেখানে ডঃ আম্বেদকর লিখেছেন-
[9] What a Hindu is to a Muslim! To the Muslims a Hindu is a Kaffir. A Kaffir is not worthy of respect. He is low - born and without status. That is why a country which is ruled by a Kaffir is Dar - ul - Harb to a Musalman. Given this, no further evidence seems to be necessary to prove that the Muslims will not obey a Hindu government. The basic feelings of deference and sympathy, which predispose persons to obey the authority of government, do not simply exist. (Pakistan Or The Partition Of India)
এবং এটা শেষ নয়। ডঃ আম্বেদকর তার বিভিন্ন বইতে লিখেছেন। যে আমি যখন ভারতের দলিত ও অছুত মাহার সমাজ কে এমন একটি ধম্ম কথা বলেছি। তখন মূলনিবাসী মুসলিমরা এর বিরোধ করেছে। তারা বলেছে। আমরা ইসলাম ত্যাগ কে করে অন্য কোনো মতবাদ কে সমর্থন করতে পারবো না। আপনি আমাদের কাছে জীবন চাইলে দিতে পারি। কিন্ত ধর্ম ছাড়তে পারবো না। যতই আমরা লাঞ্ছিত হই না কেন। [তারপর আমরা জানি ডঃ আম্বেদকর ইতিহাসে সব থেকে বড়ো ধর্মান্তরিত সভা করে। ডঃ আম্বেদকর বৌদ্ধ ধম্মের এক নতুন শাখা করে তার নাম নববৌদ্ধ যেখানে সবার সমান অধিকার আছে। তাই বলে এই লেখাতে আমি বৌদ্ধ ধম্ম সমর্থন করি না। এবং সংবিধানের সময়ও এটা দেখলো ভারতের মুসলিম সমাজ কতটা কুসংস্কার তথা ধর্মান্ধ। ডঃ আম্বেদকর লিখেছেন- ভারতের ব্রাহ্মণ সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচার হাজার বছরের তার পরেও মুসলিম সমাজ শরিয়ার মতো আঘাতমূলক আইনের চিন্তা করে। যতটা না মনুস্মৃতি আমাদের বঞ্চিত করেছে। তেমনি শরিয়া আইন ও মুসলিমদের আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ডঃ আম্বেদকর আর লিখেছেন। ভারতের মুসলিমরা কোনোদিন ভারত কে ভালো বাসতে পারে না। তার কারণ ইসলাম এর অধিক দেয় না। ভারতের মূলনিবাসী ধর্মের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত তাহলেই ভারতের দলিতরা ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে বিচ্যুত হবে। (Pakistan Or The Partition Of India)
ইতিহাস কোনোদিন শেষ হবে না। ভারতের হিন্দুরা দেখেছেন তারা কি ভাবে বারবার আক্রান্ত হয়েছে। আর Rss এখানেই সেই সময়ের ইতিহাস কে ব্যবহার করে। নিজেদের অস্তিত্ব শক্ত করেছে। সেই সময়ের ভুল গুলি আজকের Rss ফায়দা দিচ্ছে। আপনারা যতবেশি অসাম্প্রদায়িকতার নামে ইতিহাস কে আলু কে ভাগ করবেন। Rss সেই আলু দিয়ে ইতিহাসের তরবারি করবে। আমরাই এক ভাবে ভুল ভাবে Rss কে শক্তিশালী করেছে। ভারতে যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদের ফলে মানুষ সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক ভাবে আক্রান্ত তেমনি ইসলামের জন্য বারবার মানুষ আক্রান্ত আর আপনাদের নীরবতা Rss কে শক্ত করে দেয়। মুসলিমদের হাতে অনার কিলিং হলে আপনারা চুপ থাকেন। আর উচ্চ বর্ণ হিন্দুদের হাতে দলিত মরলে আপনারা মিছিল করেন। দিনের পর দিন একটি ধর্মীয় সমাজ ভুলের উপর ভুল করলে আপনারা চুপ থাকেন। এখনো চুপ থাকেন। একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করেন। যে কাজ Rss এর সেই কাজ আপনারা করে চলেছেন। ইতিহাস কে আর কত বিকৃত করবেন। সময় এসেছে সত্য ইতিহাসের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও আরব্য সাম্রাজ্যবাদ কে দমানোর....

তথ্যসূত্র

1 || আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর - আবুল মনসুর আহমদ
2 || MARX NOTES ON INDIAN HISTORY
3 || ভারত বিভাজন যোগেন্দ্রনাথ ও ডঃ আম্বেদকর - শ্রীবিপদভঞ্জন বিশ্বাস
4 || Pakistan or The Partition Of India - B.R Ambedkar

পেরিয়ার ঈশ্বর নিয়ে এমন কিছু প্রশ্ন করেছেন যেগুলি সমস্ত ব্যক্তিদের জানা উচিত-

ভাষান্তর -অরিজিৎ।

স্বাধীনতার পরে এবং তার আগেও দক্ষিণ ভারতের রাজ্য বিশেষ করে তামিলনাড়ু তে পেরিয়ারের খুবই গভীর প্রভাব থাকতে দেখা যায়।

দক্ষিণ ভারতের লোক ওনাকে খুবই সম্মান করেন পেরিয়ারের নামে চলচিত ই, বি, রামাস্বামির না শুধু সাংস্কৃতিক তবে তামিলনাডুর সামাজিক এবং রাজনীতি দিক থেকে ও প্রভাব এত গভীর যে কমিউনিস্ট হোক অথবা দলিত আন্দোলনের সাথে যুক্ত লোক সব ওনার থেকে প্রভাবিত হয়েছে।

তামিল রাষ্ট্রভুক্ত থেকে ধরে নাস্তিক তর্কবাদী নারীবাদী দেখে আন্দোলন করা লোক সবাই উনার সম্মান করেন উনার বিচার এবং কাজের সাক্ষী দেন এবং ওনাকে একজন মার্গ দর্শক রূপে গণ্য করেন। তর্কবাদী নাস্তিক এবং পিছিয়ে পড়া দের পক্ষে কাজ করার কারণে উনার সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অনেক উচ নিচ দেখা যায়

পেরিয়ার ই, বি, রামাস্বামী (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯-/ ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩) বিশ শতাব্দীর তামিলনাডুর একজন গুরুত্বপূর্ণ এবং লোক প্রিয় রাজনেতা ছিলেন ওনাকে পেরিয়ার নামে ডাকা হয় আসলে তামিলে সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য এই শব্দ ব্যবহার করা হয়

উনি হিন্দুত্বের প্রবল বিরোধী ছিলেন জাস্টিস পার্টি গঠনের সময় হিন্দুত্বের বিরোধ ছিল উত্তর ভারতের হিন্দি পশ্চিম ভারতের বাংলা এলাকায় যদিও ওনার লোকপ্রিয়তা কম কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তেই চলেছে এখন

ভারতীয় বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয় সমাজের পিছিয়ে পড়া শোষিত লোকেদের অবস্থা বদলানোর এবং একটি তর্কশীল সংস্কৃতিক আন্দোলন চালানোতে উনার নাম সবচেয়ে উপরে আছে

পেরিয়ারের মূর্তির নিচে লেখা ছিল - ঈশ্বর নেই এবং ঈশ্বর একদম নেই যে ঈশ্বরকে বানিয়েছে ও বোকা যে ঈশ্বরের প্রচার করে ও দুষ্ট আর জে ঈশ্বরের পূজা করে ও একজন বব্বর।

এই ধরনের করা শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্ন করার কারণে পেরিয়ার কে ভারতীয় হিন্দুত্ব সমাজ সব সময় দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে কিন্তু যখন আজকে ভারতে নাস্তিকতা এবং তর্কশীল আন্দোলন সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সব জায়গায় ছড়াচ্ছে আর নাস্তিকদের সংখ্যা বাড়ছে লোক খুব বড় সংখ্যায় উনার যুক্তি সিদ্ধান্ত প্রশ্ন ইত্যাদি প্রচারিত করছেন।

আসেন দেখি মহান তর্কশীল নাস্তিক এবং সমাজ কল্যাণী পেরিয়ার ঈশ্বরকে কি কি প্রশ্ন করেছেন তবে এ প্রশ্নগুলো বলতে গেলে তো সামাজিক কুসংস্কার গুলোকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে।

১) তুমি কি ভীতু যে সবসময় লুকিয়ে থাকো কখনো কারো সামনে আসো না

2. আপনি কি একজন সুখী ব্যক্তি যিনি মানুষকে দিনরাত ইবাদত ও প্রার্থনা করতে বাধ্য করেন?

৩) আপনি কি সবসময় ক্ষুধার্ত যারা মানুষের কাছ থেকে মিষ্টি, দুধ, ঘি ইত্যাদি নিয়ে থাকেন?

৪) আপনি কি একজন আমিষভোজী যিনি মানুষকে দুর্বল পশু বলি দিতে বলেন? ৫) আপনি কি একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী যিনি লক্ষ লক্ষ টন সোনা পুঁতে রেখে মন্দিরে বসে আছেন?

৬) তুমি কি ব্যভিচারিণী যে মন্দিরে দেবদাসী রাখে?

৭) আপনি কি দুর্বল যারা প্রতিদিন ঘটে যাওয়া ধর্ষণ বন্ধ করতে পারে না?

৮) তুমি কি বোকা, যারা পৃথিবীর দেশে তেল না খেয়ে নদীতে দুধ-ঘি ফেলে দেয়?

৯) আপনি কি বধির যারা নিরপরাধ মানুষদের ধর্ষিত, অকারণে মারা যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পান না? ১০) আপনি কি অন্ধ যে প্রতিদিন অপরাধ ঘটছে তা দেখতে পাচ্ছেন না?

১১) আপনি কি সেই সন্ত্রাসীদের সংস্পর্শে আছেন যারা প্রতিদিন ধর্মের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে?

১২) আপনি কি একজন সন্ত্রাসী যিনি চান যে লোকেরা আপনাকে ভয় পায়?

১৩) আপনি কি বোবা যিনি একটি শব্দও বলতে পারেন না কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনাকে লক্ষ লক্ষ প্রশ্ন করে?

১৪) আপনি কি সেই দুর্নীতিবাজ যারা গরীবকে কখনও কিছু দেন না যখন গরীবরা আপনার উপর পশুর মত কাজ করে অর্জিত সমস্ত অর্থ ত্যাগ করে?

১৫) তুমি কি বোকা যে আমাদের মত নাস্তিক সৃষ্টি করেছ যারা তোমাকে মিথ্যা বলে এবং তোমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে?

মৃত্যুর পূর্বে জেলে বসে দীনেশ গুপ্ত কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিগুলো পড়লে বোঝা যায়, তাঁর ভাবনার গভীরতা। ১৯৩১ সালের ১৮ জুন, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বসে বৌদিকে লিখছেন,

"যে দেশে মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষের ধর্ম নষ্ট হয়, সে দেশের ধর্ম আজই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। সবার চাইতে বড় ধর্ম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা ধর্মের নামে অধর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। একটা তুচ্ছ গরুর জন্য, না হয় একটু ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমরা ভাই ভাই খুনোখুনি করিয়া মরিতেছি।এতে কি ভগবান আমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলিয়া রাখিবে, না খোদা বেহেস্তে আমাদিগকে স্থান দিবেন?"

রিচার্ড ডকিন্সের একটি ইন্টারভিউ

ভাষান্তর- সুমিত্রা পদ্মনাভন

রেডিও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক: ঈশ্বর তো অপ্রমাণিত হননি। তাহলে কোন যুক্তিতে "ঈশ্বর নেই বলছেন"।

রিচার্ড ডকিন্স: সে তো পরী বা ইউনিকর্ন কিছুই অপ্রমাণিত হয়নি। কিন্তু বিশ্বাস করার স্বপক্ষে কোনও কারণও দেখছি না, তাই বিশ্বাস করি না।

['ইউনিকর্ন' পক্ষীরাজের মত এক কাল্পনিক এক শিংওয়ালা ঘোড়া]

সঞ্চালক: সম্ভবনার কথা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাহলে আপনি নিজেকে অ্যাগনোস্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী বলেন না কেন?

ডকিন্স: ওরকম অদ্ভুত কথা বলতে যাব কেন? তাহলে তো বলতে হয় পক্ষীরাজ ঘোড়া বা হুরী-পরীও সত্যি আছে কিনা আমি জানি না। সম্ভবনার কথা যদি বলেন, তাহলে ঈশ্বর নামক কেউ (কোনও মহিলা, পুরুষ বা বস্তু) আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভবনা এতই কম, যে শতকরা হিসেবে একেরও নীচে, শূন্যই বলা যায়। তাই অজ্ঞেয়বাদ-টাদ না বলে, নিরীশ্বরবাদ-ই সঠিক বলে মনে করি।

টেলিফোনে এক দর্শক: ধর্ম সমাজের উপকার করে, একথা তো মানেন?

ডকিন্স: ধর্মবিশ্বাস সমাজ প্রচুর ক্ষতি, প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়েছে। সমাজের উপকার করেছে কোনও সময়, একথা মানলে প্রমাণ হয় না যে ঈশ্বর বলে কিছু আছে। বরং ধর্মের নামে অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে। এটা তো দেখাই যাচ্ছে।

দর্শক: নাস্তিকরা সমাজের অনেক ক্ষতি করেছে। যেমন হিটলার, স্ট্যালিন। কত হত্যা করেছে।

ডকিন্স: স্ট্যালিন যা করেছেন, তা নাস্তিকতার নামে করেননি। তিনি এক রাজনৈতিক মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে করেছিলেন। আর হিটলার তো রোমান ক্যাথলিক ছিলেন, নাস্তিক আবার কোথায়? তিনি 'এথেনিক ক্লেনজিং' বা জাতিগতভাবে হত্যা করে একটি জাতিকে নির্মূল করাতে বিশ্বাসী ছিলেন।

এরপর বেশ মজা হল। ডকিন্স যেই বলতে লাগলেন হিটলারের কথা, বিশদভাবে ওঁর ইহুদিদের প্রতি জাতিঘৃণা, একটি বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর প্রতি গোঁড়া মনোভাবের কথা, টেলিফোনের বক্তা বলে উঠলেন — "যাই হোক, একজন হিটলার তো কিছু প্রমাণ করে না। কত ধার্মিক মানুষ আছেন যারা সৎ...."

তখন ডকিন্স হাসতে হাসতে বললেন — 'হিটলারের কথা তো আপনিই তুলেছিলেন, আমি না। আমিও তো বলছি কোনও বিশেষ নাস্তিক মানুষ যদি অন্যায় কাজ করেও থাকেন, তাতে প্রমাণ হয় না, নাস্তিকতা ভ্রান্ত বিশ্বাস। বরং ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি বহু ধার্মিক বন্ধু আছেন, যাঁরা আদ্যোপান্ত ভালো মানুষ। এতেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।

এরপর মধ্যপ্রাচ্যের একজন মহিলা ফোনে অনেকক্ষণ কথা বললেন। ডকিন্স সাহেবের বইকে এবং ওঁর নাস্তিকতা প্রচারকে আপত্তিজনক বললেন। তাতে ডকিন্সের প্রতিক্রিয়া —

ডকিন্স: আপনি কি মনে করেন কারোর ব্যক্তিগত মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই?

মহিলা: না, তা নয়।

ডকিন্স: আপনি যেমন আপনার মতে চলেন ও আপনার বিশ্বাস প্রচার করেন, আমিও আমার বিশ্বাস প্রচার করতে পারি তো?

মহিলা: হ্যাঁ, কিন্তু আপনার 'ঈশ্বর নেই' এসব বলাতে আমার ঘোর আপত্তি, আপনি এটা করতে পারেন না। আমি আপনার কথা মানি না (উত্তেজিত)

ডকিন্স: আপনি আমার বইটা পড়েছেন? (দ্য গড ডিল্যুশন)

মহিলা: না।

ডকিন্স: তাহলে আপনার কী করা উচিৎ? বইটা পড়ে আমাকে বলুন — 'এই জায়গাটা আমার ভালো লাগেনি', 'এটা আপনি ভুল লিখেছেন' ...ইত্যাদি। না পড়েই শুধু মানি না, মানি না বলে চেঁচালে হবে?

মহিলা: চুপ।

এরপর আরেকজন (সম্ভবত পাদ্রী) বললেন, 'আমি শুনেছি যে, আপনি নাকি বলেছেন শিশুদের ধর্মাচারণ করানো শিশুদের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার? এমনকি তা নাকি 'শিশু নির্যাতন' - এর পর্যায়ে পড়ে?

ডকিন্স: না, ভুল শুনেছেন। আমি বলেছি শিশুদের বোঝবার বয়স হবার আগেই ধর্মীয়-ছাপ্পা মেরে দেওয়া, তাদের কোনও বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর তকমা লাগিয়ে দেওয়া ভুল। অবশ্যই শিশুদের সমস্ত ধর্ম সম্পর্কে জানা উচিৎ। ধর্মের ইতিহাস তো মানব সভ্যতারই

ইতিহাস। সমস্ত ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে জেনে বুঝে বড় হয়ে ইচ্ছে হলে সে একটি বিশেষ ধর্মকে বেছে নেবে বা কোন ধর্মই নেবে না। আর একটা কথা, ধর্মের নামে ভয় দেখানোটা অবশ্যই 'শিশু নির্যাতনের' মধ্যে পড়ে। আমার অনুরোধ শিশুদের কখনোই পাপ, নরক, নরকের অগ্নিকুন্ড ইত্যাদির ভয় দেখাবেন না। এটা অন্যায়।

এরপর সঞ্চালক জিজ্ঞেস করলেন, ধর্ম ছাড়া পৃথিবী কেমন হবে? তা কি কখনও আসবে?

ডকিন্স: নিশ্চয়ই আসবে। ধীরে ধীরে মানুষ সত্যিটা বুঝতে পারলে ক্রমশ ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। সৎ হতে হলে, ভালো মানুষ হতে হলে ধার্মিক বা ধর্মবিশ্বাসী হতে হয় না। তবে ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশোনা করা দরকার। মানব সভ্যতার ইতিহাস আর ধর্মগুলো অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এগুলো না জানলে ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদির রসগ্রহণ করা যাবে না শেক্সপিয়ার কি বোঝা সম্ভব, ধর্মের ইতিহাস না জেনে?

"তুলনামূলক ধর্মশিক্ষা তাই ইতিহাসের অংশ"।

শেষে একজন ফোনে জিজ্ঞেস করলেন — যদি কখনও ঈশ্বরের দেখা পান, তখন কি করবেন? 'সরি' বলবেন? বলবেন 'আমার ভুল হয়েছিল?'

ডকিন্স: কার কথা বলছেন? কোন ঈশ্বর? জিউস? আল্লা? হিন্দুদের শিব? কার দেখা পাবো? হাসতে হাসতে বললেন 'ঐ যে বললাম, এরকম হওয়ার সম্ভবনা এতই কম যে হিসাবের মধ্যেই আসে না'।

প্রশ্নকর্তা: এই সৃষ্টি! এর তো একটা সৃষ্টিকর্তা আছে। সব কিছুরই একটা রূপকার বা স্রষ্টা থাকে।

ডকিন্স: 'সে প্রশ্ন এতদিন ছিল। এখন ডারউইন এর "ন্যাচারাল সিলেকশন" থিওরিতে তো পরিস্কার হয়ে গেছে সৃষ্টির আদি রহস্য। যদি স্রষ্টা থাকে, তাহলে তো স্রষ্টারও স্রষ্টা আছে। তিনি কে? এর তো কোনও শেষ নেই। তর্কের খাতিরে যদি 'ঈশ্বরের' দেখা পাই আপনার কথামত, তাঁর কাছে জানতে চাইব বিজ্ঞানের এখনও অজানা কিছু তত্ত্ব ও তথ্য। আশাকরি তিনি (সেই মহিলা বা পুরুষ বা বস্তু) বলতে পারবেন তার উত্তর।

এটি ছিল একটি রেডিও অনুষ্ঠানে রিচার্ড ডকিন্সের প্রশ্নোত্তর পর্ব।

রিচার্ড ডকিন্স হলেন পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত নিরীশ্বরবাদী এবং ডারউইনের যোগ্য উত্তরসূরি। ওঁর দলে আরও আছেন — ক্রিষ্টোফার হিচেন্স সাহেব, যিনি মাদার টেরিজাকে নিয়ে নির্মোহ আলোচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

রিচার্ড ডকিন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিষয়: "জনমানসে বিজ্ঞানচেতনার সঞ্চার / Public Understanding of Science"। ধার্মিক রোমান ক্যাথলিক, মুসলিম সমাজ ও সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের বিরক্তি, ঠাট্টা ও আক্রমণের শিকার হয়েছেন তিনি। পশ্চিমী মিডিয়া তাঁকে 'ডারউইনের পোষা হিংস্র কুকুর' অবধি বলতে কসুর করেনি।

রিচার্ড ডকিন্স জন্মেছেন কেনিয়ায়। নয় বছর বয়সে খেয়াল করেন পৃথিবীর সবাই খ্রিস্টান নয়। আরও নানারকম ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান আছে। প্রতেকে নিজের বিশ্বাসটাকেই সঠিক এবং চরম সত্য মনে করে। এটা বুঝতে বুঝতে বছর পনের যখন বয়স, তখন উপলব্ধি করেন যে, 'ব্যক্তিগত ধর্ম একটা অ্যাক্সিডেন্ট' বা কাকতালীয় ব্যাপার। উনি খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই খ্রিস্টান। নয়ত অন্য কিছু হতেন। ঈশ্বরের চেহারা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকম। অতএব তা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

“জাতির স্বাধীনতা হরণ করতে হলে সবার আগে গণমাধ্যমের মুখ চেপে ধরো।” -বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

দেশভাগ - আমার অনুভূতি

-নিশাত বিজয়

আমার জন্ম যশোর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম শিমুলিয়ায়। আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে এই গ্রামে। আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন আমার প্রাইমারি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আতিয়ার রহমান যাকে আমার সেকেন্ড স্যার ডাকতাম তিনি একদিন ক্লাসে বললেন, "রবি ঠাকুরের বদলে নজরুলের নোবেল পাওয়ার কথা ছিল।"

এজন্য রবী ঠাকুর নজরুলকে বোবা(বাকশক্তিহীন) করতে বিষ খাইয়ে দেই, ফলে নোবেল জিতে রবী ঠাকুর। হিন্দুরা হল লাল পিপড়া যেটা কামড়ালে মুসলমানরা কষ্ট পাই আর মুসলিমরা হল কালো পিপড়া যেটা কামড়ালেও কেউ কষ্ট পাই না, রবী ঠাকুর হল লাল পিপড়া এজন্য নজরুলের এভাবে ক্ষতি করেছে।

এই ঘটনার আগে আমি হিন্দু-মুসলিম যে আলাদা এমন কিছু জানতাম না। আমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলিম সবাই ছিল, আমার সব বাড়িতেই যাতায়াত ছিল কিন্তু আমি এসব বিভেদ জানতাম না। এই ঘটনা আমাকে বেশ ধাক্কা দেই, আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আমার পিতাই। আমি আব্বুকে বললাম, আব্বু সেকেন্ড স্যার তো আজ এই ঘটনা বললো। তখন প্রগতিশীল রাজনীতিতে জড়িত আমার আব্বু বললো স্যার ভুল কথা বলেছেন, হিন্দু-মুসলিম উভয়ের ভিতরে যেমন ভাল মানুষ আছে তেমনি উভয়ের ভিতরেই খারাপ মানুষ আছেন। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পেয়েছেন কবি নজরুল তখনও কবিতা লিখতে শুরু করেননি। আমার মাথায় তারপর থেকেই ঘুরতে লাগলো কেন স্যার আমাকে মিথ্যা তথ্য দিলেন।

ছোটবেলার আরেকটি স্মৃতি আমাকে দারুণভাবে রোমাঞ্চিত করে। ঈদে আর দূর্গাপূজায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সোনাই নদীতে নৌকা বাইচ হতো। নৌকা বাইচে দেখতে আব্বুর সাথে মোটরসাইকেলে যেতাম সোনাই নদীতে, বাংলাদেশের এপারের জায়গাটির নাম সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার ভাদলি আর সীমান্তের ওপারে ভারতের হাকিমপুর বাজার। নৌকা বাইচের সময় সীমান্ত খুলে দিতো কয়েক ঘন্টার জন্যে, আমরা ওপাওে যেতাম, ওখানে যাত্রাপালাও দেখেছি কয়েকবার। শুনেছি এখন আর নৌকা বাইচ'ই হয় না।

ধীরে ধীরে চিন্তাজগতে এসব প্রভাব ফেলতে শুরু করলো দুইপারের ভাষা এক, তারপরও কেন আমরা ওখানে সবসময় যেতে পারি না, হিন্দু-মুসলিমের ভাষা একই, আচার-ব্যবহার একই তারপরও এসব বিদ্বেষ কেন! একে একে পড়তে শুরু করলাম ট্রেন টু পাকিস্তান, জয়া চ্যাটার্জিও 'ভারত কেন ভাগ হল', বুঝতে শুরু করলাম এই আচারণের মনস্তত্ত্ব। বঙ্গভঙ্গ, ভারত ভাগ, ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাব, নোয়াখালী গণহত্যা, কলকাতা দাঙ্গা সম্পর্কে যখন পড়তে শুরু করলাম তখন অনেককিছুই বুঝতে সুবিধা হল।

বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে ফেসবুকে গুজব ছড়িয়ে রামু, নাসিরনগর, ভোলা, মালোপাড়ায় হিন্দু-বৌদ্ধদের উপরে যে হামলা করেছে সংঘবদ্ধ মৌলবাদী চক্র সেটার পিছনে আছে ভারত ভাগের সময় তৈরি হওয়া সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব। তারা চাই এদেশ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সব চলে যাক, এই দেশ কেবল মুসলমানের দেশ। এই মৌলবাদীদের জন্যে প্রধান বাধা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যেখানে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই দেশ পাকিস্তানী শত্রু মুক্ত করেছিল।

সাম্প্রদায়িক এই আচারণ দেখে মনে হয়, দেশভাগই হচ্ছে এই উপমহাদেশে চলা চলমান বিদ্বেষের মূল কারণ। কাঁটাতারের দেওয়াল তুলে কখনো বিদ্বেষ দূর করে কোন দেশ শান্তিতে থাকতে পারে না। ভারতে গরু খাওয়া নিয়ে মুসলিম পিটিয়ে মারা আর বাংলাদেশে ইসলাম অবমাননার ভুয়া অভিযোগ তুলে হিন্দু-বৌদ্ধদের উপর হামলার উপর হামলা চলছে অথচ সাতচল্লিশে ভাবা হয়েছিল যে, দেশ বিভক্ত করলেই বোধহয় সকল সমস্যার সমাধান হবে, সেই ধারণা যে কতবড় ভুল সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বর্তমান সময়ে ঘটা এই ঘটনাবলীসমূহ। আর এই সাম্প্রদায়িক বিভেদের দেওয়াল তোলার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ জাতিও বাঙালী জাতি, তারপরও আমাদের বোধদয় এখনও হয়নি যে সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলে কখনো শান্তি আনা যায় না সমাজে। বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক সীমান্ত হত্যা, তিস্তা চুক্তি নিয়ে সংকট নিয়ে কিছু দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হয়েছে। অথচ এইসব সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান কিংবা প্রতিবাদ জারী না রেখে বাংলাদেশে চলে হিন্দু বিদ্বেষী প্রচারণা। সাম্প্রদায়িকতার কারণে পানি ঘোলা হয় কেবল কিন্তু সমাধান আসেনা। দেশের কোন উপকার না হলেও হিন্দুদের উপর নিপীড়ন জায়েজ করা হয় এটার মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িকতা কেবল আমাদেও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, কোন সমাধানের পথ তৈরি করতে সক্ষম নয়।

ধর্মানুভূতির উপকথা

-হুমায়ুন আজাদ

একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় আজকাল, কথাটি হচ্ছে 'ধর্মানুভূতি'। কথাটি সাধারণত একলা উচ্চারিত হয় না, সাথে জড়িয়ে থাকে 'আহত' ও 'আঘাত' কথা দুটি; শোনা যায় 'ধর্মানুভূতি আহত' হওয়ার বা 'ধর্মানুভূতিতে আঘাত' লাগার কথা। আজকাল নিরন্তর আহত আর আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে মানুষের একটি অসাধারণ অনুভূতি, যার নাম ধর্মানুভূতি । মানুষ খুবই কোমল স্পর্শকাতর জীব, তার রয়েছে ফুলের পাপড়ির মতো অজস্র অনুভূতি; স্বর্গচ্যুত মানুষেরা বাস করছে নরকের থেকেও নির্মম পৃথিবীতে, যেখানে নিষ্ঠুরতা আর অপবিত্রতা সীমাহীন; তাই তার বিচিত্র ধরনের কোমল অনুভূতি যে প্রতিমুহূর্তে আহত রক্তাক্ত হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন সুদিন আসবে, সে আবার স্বর্গে ফিরে যাবে, তখন ওই বিশুদ্ধ জগতে সে পাবে বিশুদ্ধ শান্তি; সেখানে তার কোনো অনুভূতি আহত হবে না, ফুলের টোকাটিও লাগবে না তার কোনো শুদ্ধ অনুভূতির গায়ে। অনন্ত শান্তির মধ্যে সেখানে সে বিলাস করতে থাকবে। কিন্তু পৃথিবী অশুদ্ধ এলাকা, এখানে আহত হচ্ছে, আঘাত পাচ্ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে তার নানা অনুভূতি- এটা খুবই বেদনার কথা; এবং সবচেয়ে আহত হচ্ছে একটি অনুভূতি, যেটি পুরোপুরি পৌরাণিক উপকথার মতো, তার নাম ধর্মানুভূতি। মানুষ বিশ্বকে অনুভব করে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে; ইন্দ্রিয়গুলো মানুষকে দেয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শ্রুতির অনুভূতি; কিন্তু মানুষ, একমাত্র প্রতিভাবান প্রাণী মহাবিশ্বে, শুধু এ-পাঁচটি ইন্দ্রিয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তার আছে অজস্র ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রিয়। তার আছে একটি ইন্দ্রিয়, যার নাম দিতে পারি সৌন্দর্যেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে অনুভব করে সৌন্দর্য; আছে একটি ইন্দ্রিয়, নাম দিতে পারি শিল্পেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে উপভোগ করে শিল্পকলা; এমন অনেক ইন্দ্রিয় রয়েছে তার, সেগুলোর মধ্যে এখন সবচেয়ে প্রখর প্রবল প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তার ধর্মেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে অনুভব করে ধর্ম, তার ভেতরে বিকশিত হয় ধর্মানুভূতি, এবং আজকের অধার্মিক বিশ্বে তার স্পর্শকাতর ধর্মানুভূতি আহত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয় ভোরবেলা থেকে ভোরবেলা। অন্য ইন্দ্রিয়গুলোকে পরাভূত ক'রে এখন এটিই হয়ে উঠেছে মানুষের প্রধান ইন্দ্রিয়; ধর্মেন্দ্রিয় সারাক্ষণ জেগে থাকে, তার চোখে ঘুম নেই; জেগে জেগে সে পাহারা দেয় ধর্মানুভূতিকে, মাঝেমাঝেই আহত হয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে এবং বোধ করে প্রচণ্ড উত্তেজনা। এটা শিল্পানুভূতির মতো দুর্বল অনুভূতি নয় যে আহত হওয়ার যন্ত্রণা একলাই সহ্য করবে। এটা আহত হ'লে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ধর্মানুভূতির উত্তেজনা ও ক্ষিপ্ততায় এখন বিশ্ব কাঁপছে।

আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া সুখকর অনুভূতি নয়; শরীরে আঘাত পেলে আমরা চিৎকার ক'রে উঠি। শরীরের থেকেও মনোরম যে-সব ইন্দ্রিয় আছে আমাদের, সেগুলো আহত হ'লেও চিৎকার ক'রে ওঠার কথা; তবে সেগুলোর চিৎকারের স্বর আমরা শুনতে পাই না।

আমার অজস্র অনুভূতি দিনরাত আহত হয়; পত্রপত্রিকায় গ্রন্থে গ্রন্থে নিকৃষ্ট শিল্পকলাহীন কবিতার মতো ছোটো বড়ো পংক্তির প্রাচুর্য দেখে আহত হয় আমার কাব্যানুভূতি, নিকৃষ্ট লঘু অপন্যাসের লোকপ্রিয়তা দেখে আঘাত পায় আমার উপন্যাসানুভূতি; রাজনীতিবিদদের অসততা ভণ্ডামোতে আহত হয় আমার রাজনীতিকানুভূতি; এবং আমার এমন অজস্র অনুভূতি নিরন্তর আহত রক্তাক্ত হয়, আমি ওগুলোর কোনো চিকিৎসা জানি না, ওগুলো নিয়ে আমি কোন জঙ্গলে কোন রাস্তায় চিৎকার করবো, তাও জানি না। রাষ্ট্র এগুলোকে অনাহত রাখার কোনো ব্যবস্থা করে নি, রাষ্ট্রের মনেই পড়ে নি এগুলোর কথা।

রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব নয় আমার এসব অমূল্য অনুভূতিকে অনাহত রাখার সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেয়া? সবাই বলবে এটা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে তাকে খুলতে হবে একটি বিকট 'অনুভূতি মন্ত্রণালয়', যার কাজ হবে কোটি কোটি মানুষের কোটি কোটি অনুভূতির হিশেব নেয়া, সেগুলোর আহত হওয়ার সূত্র বের করা, এবং সেগুলোকে সব ধরনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। আমার শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি রাজনীতিকানুভূতি কাব্যানুভূতি প্রভৃতি পাহারা দেয়া রাষ্ট্রের কাজ নয়, কিন্তু এখন রাষ্ট্র এক উদ্ভট দায়িত্ব নিয়েছে, মনে করছে ধর্মানুভূতি পাহারা দেয়া তার কাজ; তাই রাষ্ট্র দেখে চলছে কোথায় আহত হচ্ছে কার ধর্মানুভূতি।

আমার শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি রাজনীতিকানুভূতি কাব্যানুভূতিকে কেনো রাষ্ট্র পাহারা দিচ্ছে না, কেনো আইন তৈরি করছে না এগুলোকে অনাহত রাখার? তার কারণ রাষ্ট্র শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে না, শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি হাস্যকর রাষ্ট্রের কাছে, বা রাষ্ট্র মনে করে শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা যতোই আহত বা নিহত হোক, রাষ্ট্রের কিছুই করার নেই। কিন্তু ধর্মানুভূতি এমন তুচ্ছ হাস্যকর ব্যাপার নয়, তা অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ; রাষ্ট্র এতে বিশ্বাস করে, তাই রাষ্ট্র একে অক্ষত রাখার জন্যে ব্যগ্র।

কিন্তু ধর্মানুভূতি কী বস্তু, যাকে অনাহত অক্ষত রাখার জন্যে রাষ্ট্র এতো তৎপর? বিজ্ঞান, গত কয়েক শতাব্দীতে, এগিয়েছে অনেক, এবং মহাবিশ্বের রূপ এখন আমরা জানি বৈজ্ঞানিকভাবে, যাতে কোনো অলৌকিক পুরাণ নেই; তবু আজো পৃথিবীকে আবৃত ক'রে আছে পৌরাণিক সংস্কৃতি। আমরা মানসিকভাবে আজো বাস করছি পৌরাণিক বিশ্বেই, যে-বিশ্ব প্লাতো, আরিস্ততল, টলেমি ও বিভিন্ন পৌরাণিক বইয়ের। মহাবিশ্বের পৌরাণিক রূপ বদলে দিয়েছেন কোপারনিকাস কেপলার গ্যালিলিও নিউটন আইনস্টাইন, যার সাথে কোনো মিল নেই পৌরাণিক বইগুলোর বিশ্বের, তবে আমাদের কল্পজগতে তার কোনো স্থান নেই, আমাদের কল্পজগত জুড়ে আছে পৌরাণিক বিশ্ব। ওই বিশ্ব চলে পৌরাণিক বিশ্বাসের নিয়মে, যদিও তা সম্পূর্ণ অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক বা ভুল ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের কল্পজগত ও বাস্তব জগতের মধ্যে চলছে বিরোধ; মানুষ এখন বাস করছে পুরাণ ও বিজ্ঞানের নিরন্তর বিরোধিতার মধ্যে। ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিলো পৌরাণিক মানুষের বিস্ময়বোধ, ভয়, ও লোভ থেকে; তারা কল্পনা করেছিলো বহু দেবতা, বহু বিধাতা, এক সময় অসংখ্য দেবতায় তারা ভ'রে ফেলেছিলো আকাশমণ্ডলকে। ওই সব দেবতাকে তারা ধ্রুব ব'লে মনে করতো, যারা মানতো না ওই সব দেবতা, তাদের পীড়ন করা হতো। তারপর মানুষ উদ্ভাবন করতে থাকে নতুন নতুন দেবতা বা বিধাতা, আগের দেবতা বা বিধাতাদের অসত্য ব'লে বাতিল ক'রে দেয়, যদিও এক সময় তারাই পূজিত হতো চরম সত্য ব'লে। দেবতা বা বিধাতায় বিশ্বাস, তার পুজো-আরাধনা ধর্মের একটি বড়ো ব্যাপার; তারচেয়েও বড়ো ব্যাপার হচ্ছে ওই সব বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিতার মধ্য দিয়ে বিশেষ ধরনের সমাজকাঠামো তৈরি করা। তবে বিশেষ কোনো ধর্ম কোনো অবিনশ্বর ব্যাপার নয়; গত পাঁচ হাজার বছরে পৃথিবীতে কয়েক হাজার ধর্ম প্রস্তাবিত হয়েছে, অনেক ধর্ম কয়েক হাজার বছর ধ'রে প্রচলিত থেকে নতুন ধর্মের আক্রমণে লুপ্ত হয়ে গেছে।

ধর্ম কি যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন? ধার্মিকেরাই স্বীকার করেন যে যুক্তি দিয়ে ধর্ম চলে না, ধর্ম চলে যুক্তিরহিত অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে; ধর্মে কোনো প্রশ্ন নেই, নতুন কোনো উত্তর নেই; সব প্রশেড়বর উত্তর দেয়া হয়ে গেছে পুরোনো বইগুলোতে, সব সত্যের আকর হচ্ছে ওই বইগুলো।

তবে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের বইয়ে বিশ্বাস করে না, সাধারণত প্রচণ্ড বিরোধিতা করে, এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষকে ধর্মহীন ব'লেই গণ্য করে; আর সব ধর্মের মানুষই মনে করে ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার, সেখানে যুক্তি অচল। পৃথিবীতে সব কিছুই চলে যুক্তির সাহায্যে : গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি থেকে শরু ক'রে সব কিছুই চলে যুক্তির সাহায্যে, কোনো জ্ঞানই যুক্তি ছাড়া সম্ভব নয়, কোনো সত্যই যুক্তি ছাড়া উদ্ঘাটন করা যায় না। অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে আমরা ধান উৎপাদন করতে পারি না, বিশ্বাস দিয়ে আমরা গাড়ি চালাতে পারি না, বা খালের ওপর একটি বাঁশের সাঁকোও তৈরি করতে পারি না; কিন্তু বিশ্বাস দিয়ে আমরা একটি অসামান্য কাজ করতে পারি;- মৃত্যুর পর যেতে পারি চিরসুখের জগতে।

মানুষের শুধু একটি এলাকাই আছে, যেখানে যুক্তি চলে না; সেটি খুবই ভিন্ন রকম এলাকা, সেখানকার সব সত্য লাভ করা যায় অযুক্তি আর অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে। মানুষের এই অন্ধ বিশ্বাসই অভিহিত হয়ে থাকে ধর্মানুভূতি নামে।

মানুষের ধর্মানুভূতিগুলো অভিন্ন নয়, যেহেতু ধর্ম একটি নয়; অজস্র ধর্মবিশ্বাসে পৃথিবী বিব্রত। একেক ধর্মের মানুষের ধর্মানুভূতি একেক রকম, আবার একই ধর্মের ভেতরে রয়েছে বহু উপগোত্র, এবং বিভিন্ন উপগোত্রের ধর্মানুভূতি বিভিন্ন। প্রতিটি ধর্মেই দেখা যায় সাধারণ বিশ্বাসীরা ধর্মের মূলকথাগুলো ঠিকমতো জানে না, তারা ধর্মে সংযোজিত করে নানা নতুন বিশ্বাস, যেগুলোর

সাথে ধর্মের মূল বিশ্বাসগুলোর সম্পর্ক নেই। অজস্র ব্যাপার জড়ো হয়ে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় এক ধরনের যুক্তিরহিত বোধ, যাকে বলা হয় ধর্মানুভূতি। এই ধর্মানুভূতিই আহত হয়, এর গায়েই সাধারণত আঘাত লাগে।

ধর্মানুভূতিতে যে আঘাত লেগেছে, তা যে আহত হয়েছে, তা বোঝার ও পরিমাপ করার কোনো উপায় নেই। অযৌক্তিক ব্যাপারকে যুক্তির সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না। বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র এখন যেভাবে চলছে, তাতে প্রতিটি ধার্মিকের ধর্মানুভূতি প্রতিমুহূর্তেই আহত হ'তে পারে, এবং হচ্ছে ।

পৃথিবীতে সম্ভবত এখন বিশুদ্ধ ধার্মিক নেই, থাকলে তাদের ধর্মানুভূতি খুবই আহত হতো। যেমন, মন্দির দেখে আহত হ'তে পারে একজন ধার্মিক মুসলমানের ধর্মানুভূতি, কেননা তার বিশ্বাসের জগতে মন্দির থাকতে পারে না; আবার মসজিদ দেখে আহত হ'তে পারে একজন ধার্মিক হিন্দুর ধর্মানুভূতি, কেননা তার বিশ্বাসে মসজিদ অবাঞ্ছিত। একজন খাঁটি মুসলমান যদি দাবি করে যে মন্দির দেখে তার ধর্মানুভূতি আহত হয়েছে, তাই মন্দিরটিকে নিষিদ্ধ করতে হবে, তখন রাষ্ট্র কী করবে; একজন খাঁটি হিন্দু যদি দাবি করে যে মসজিদ দেখে তার ধর্মানুভূতি আহত হয়েছে, তখন কী করবে রাষ্ট্র? খাঁটি ধার্মিকের কোমল ধর্মানুভূতি আহত হ'তে পারে প্রতিমুহূর্তেই; টেলিভিশন, সিনেমা, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের, সংসদে নারীদের দেখে আহত হ'তে পারে তার ধর্মানুভূতি, এবং সে এসব নিষিদ্ধ করার জন্যে আবেদন জানাতে পারে। পৃথিবী ও গ্রহগুলো ঘোরে সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে 'বিগ ব্যাং' বা মহাগর্জনের ফলে, সেটি হঠাৎ সৃষ্টি হয় নি, হয়েছে আজ থেকে এক হাজার থেকে পনেরশ কোটি বছর আগে, তারপর থেকে সম্প্রসারিত হয়ে চলছে, সূর্য আর গ্রহগুলো উদ্ভূত হয়েছে সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে, মানুষ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে আসেসনি, বিবর্তনের ফলে বিকশিত হয়েছে বিশ থেকে চলি-শ লক্ষ বছর আগে, পাহাড়গুলো পেরেক নয় ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক সত্য বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়;- এগুলোতে প্রচণ্ডভাবে আহত হ'তে পারে ধার্মিকদের ধর্মানুভূতি, তারা এগুলো নিষিদ্ধ করার জন্যে দাবি জানাতে পারে। তখন রাষ্ট্র কী করবে? রাষ্ট্র কি নিষিদ্ধ করবে বিজ্ঞান? তারপর ধর্মানুভূতি যেহেতু সম্পটর্ণরূপে অযৌক্তিক, তাই তা কতোটা আহত হলো, তা পরিমাপ করার উপায় নেই। যুক্তি দিয়ে অযুক্তিকে মাপা যায় না।

কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস বা ভাবাদর্শ পোষণ, লালন, সংরক্ষণ কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব? রাষ্ট্র যদি কোনো ভাবাদর্শ চাপিয়ে দেয় তার অধিবাসীদের ওপর, তাহলে তা হবে ভাবাদর্শগত স্বৈরাচার। সব ধরনের ভাবাদর্শই সন্দেহজনক ও পীড়নমূলক, আর পৌরাণিক ভাবাদর্শগুলো শুধু পীড়নমূলকই নয়, সেগুলো মানুষকে ক'রে রাখে অন্ধ, তার মননশীলতাকে ব্যাহত ক'রে তাকে বিকশিত হ'তে দেয় না। জ্ঞানের যে-বিকাশ ঘটেছে গত কয়েক শো বছরে, তা সহজে ঘটে নি; পৌরাণিক ভাবাদর্শগুলো পদেপদে বাধা দিয়েছে জ্ঞানের বিকাশে; বহু জ্ঞানীকে পীড়ন করেছে, পৌরাণিক ভাবাদর্শবাদীরা হত্যা করেছে বহু জ্ঞানীকে। পরে দেখা গেছে জ্ঞানীরাই ছিলেন ঠিক পথে, ভুল ছিলো পৌরাণিক ভাবাদর্শ, কিন্তু তা ছিলো শক্তিমান ও নির্মম। পৌরণিক ভাবাদর্শের যদিও কোনোই বাস্তব ভূমিকা নেই মানুষের জীবনে, তবু তা আজো শক্তিমান হয়ে আছে রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোর পাহারায়। জ্ঞানীর জ্ঞানের থেকে রাষ্ট্রের কাছে বেশি মূল্যবান হয়ে আছে অন্ধের ভুল বিশ্বাস। আজকের বিজ্ঞানের যুগেও পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোকে প্রবল ক'রে তোলা হচ্ছে, মাতিয়ে তোলা হচ্ছে মানুষকে পৌরাণিক বিশ্বাস দিয়ে; এবং পরিহাসের বিষয় হচ্ছে অসামান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোই ব্যবহৃত হচ্ছে পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোর প্রচারে। পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোর পক্ষে যে-কোনো অসত্য প্রচার করা যায়, এবং প্রচার করা হচ্ছে নিয়মিত, কিন্তু চরম সত্যও বলা যায় না, যা বিৎ›দ্ধে যায় পৌরাণিক বিশ্বাসের। আজকাল বই, পত্রপত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনে নিরন্তর প্রচারিত হচ্ছে পৌরাণিক বিশ্বাস, যার কোনো যুক্তিগত ভিত্তি নেই, যেগুলোর অধিকাংশই হাস্যকর নিরর্থক কথা; কিন্তু পৌরাণিক বিশ্বাসের বিপক্ষে একটি কথাও বলা যায় না বেতার ও টেলিভিশনে।

জ্ঞানের বিকাশের অর্থই হচ্ছে পুরোনো পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোকে আহত করা, শুধু আহত নয় সেগুলোকে সম্পূর্ণ বাতিল করা; কিন্তু রাষ্ট্রগুলো জ্ঞানের সুবিধাগুলো নিচ্ছে, কিন্তু পরিহার করছে তার চেতনাকে, এবং পোষণ ও পালন ক'রে চলছে পৌরাণিক বিশ্বাস।

মানুষ কোনো ধর্ম বা ধর্মানুভূতি নিয়ে জন্ম নেয় না; কিন্তু জন্মের পরই তার ওপর সক্রিয় হয়ে ওঠে পরিবারের ধর্ম বা ধর্মানুভূতি, এবং সে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় পরিবারের ধর্মগোষ্ঠিতে। মাবাবা, আত্মীয়স্বজন, এলাকা, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক, পত্রপত্রিকা, রাষ্ট্রযন্ত্র তার ভেতরে ঢোকাতে থাকে ধর্ম ও ধর্মানুভূতি, পুলিশের মতো পাহারা দিতে থাকে তাকে, এবং তার মননশীলতাকে নষ্ট ক'রে সেখানে বিকাশ ঘটাতে থাকে যুক্তিহীনতা। সে যে-ধর্মের সদস্য সেটি যদি হয় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম, তাহলে তার ধর্মানুভূতি উগ্র থেকে উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। একটি প্রশ্ন ওঠে মাঝেমাঝেই যে যারা শিক্ষিত, জ্ঞানের বিভিন্ন এলাকায় যাদের অনেকেই অর্জন করেছে সাফল্য, তারা কেনো ধর্মের মতো অযৌক্তিক বিশ্বাস পোষণ করে? তারা যে ধর্মবিশ্বাস পোষণ করে, এটাকেই মনে কর হয় ধর্মের সঠিকত্বের প্রমাণ। কিন্তু এটা কোনো প্রমাণ নয়। এ-ধরনের শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও জন্ম নেয় বিশেষ পরিবারে, বাল্যকালে তাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় ভয় ও লোভ, তা থেকে তারা কখনো মুক্ত হ'তে পারে না; তারা যুক্তি ও অযুক্তির বিরোধিতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। তারা বিরোধিতাটা বুঝতেও পারে না, কেননা মানুষ এমন অদ্ভুত প্রাণী, যে একই সাথে পোষণ করতে পারে পরস্পরবিরোধী চেতনা। ধর্ম যে শুধু পারলৌকিক অনন্ত সুখের লোভ দেখায়, তাই নয়; বাস্তব জগতেও নানা সুবিধা দেয়। প্রথা মেনে নিলে সুবিধা অনেক, না মানলে বিপদ অনেক। তাই সে ইহজাগতিক ও পরজাগতিক দু-রকম সুবিধার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাই শিক্ষিত, এমনকি বিখ্যাত মানুষদের ধর্মানুরাগও ধর্মের অভ্রান্ততার প্রমাণ নয়। ধর্ম যেহেতু ভালো ব'লে স্বীকৃত, তাই আশা করতে পারি যে ধার্মিক মানুষেরা সৎ মানুষ হবে; কিন্তু আমরা কি নিয়মিত দেখি না ধার্মিকদের শোচনীয় অসততা?

বাঙলাদেশ এখন একটি প্রবল ধার্মিক দেশ; প্রার্থনালয়ে দেশ ছেয়ে গেছে, চারপাশ উপচে পড়ছে ধার্মিকে, উদ্দাম নাচগানের মধ্যে টেলিভিশন ব্যস্ত থাকছে ধর্মপ্রচারে, নেতানেত্রীরা তীর্থযাত্রার পর তীর্থযাত্রা করছেন, দিকে দিকে চলছে ধর্মের অলৌকিক উদ্দীপনা; তাই বাঙলাদেশ ভ'রে ওঠার কথা সততায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যাপক অসততা, অতুলনীয় দুর্নীতি, সীমাহীন ধর্ষণপীড়ন। ধর্ম ও সততা হওয়া উচিত ছিলো সমানুপাতিক; কিন্তু দেখা যচ্ছে ধর্ম, ও অসততা, দুর্নীতি, ধর্ষণপীড়ন হয়ে উঠেছে সমানুপাতিক। তাহলে ধর্মানুভূতি কী দিচ্ছে আমাদের শুধু একরাশ অযৌক্তিক বিশ্বাস ছাড়া?

ধর্মানুভূতি কোনো নীরিহ ব্যাপার নয়, তা বেশ উগ্র; এবং এর শিকার অসৎ কপট দুর্নীতিপরায়ণ মানুষেরা নয়, এর শিকার সৎ ও জ্ঞানীরা; এর শিকার হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞানের সাথে ধর্মের বিরোধ চলছে কয়েক সহস্রক ধ'রে, উৎপীড়িত হ'তে হ'তে জয়ী হচ্ছে জ্ঞান, বদলে দিচ্ছে পৃথিবীকে; তবু আজো পৌরাণিক বিশ্বাসগুলো আধিপত্য করছে, পীড়ন ক'রে চলছে জ্ঞানকে। ধর্মানুভূতির আধিপত্যের জন্যে কোনো গুণ বা যুক্তির দরকার পড়ে না, প্রথা ও পুরোনো বই যোগায় তার শক্তি, আর ওই শক্তিকে সে প্রয়োগ করতে পারে নিরঙ্কুশভাবে। উগ্র অন্ধ ধর্মানুভূতি বিস্তারের পেছনে কাজ করে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি ও রাজনীতি। দরিদ্রের শিক্ষালাভের সুযোগ নেই, তাই জ্ঞানের সব এলাকাই তার অজানা; তার জ্ঞানহীন মনের ভেতর প্রতিবেশ সহজেই সংক্রামিত করে অযুক্তি ও অপবিশ্বাস; আর তাতে সে খুঁজে পায় শান্তি ও শক্তি। তার কিছু নেই ব'লে তার সাথে থাকে এক অলৌকিক মহাশক্তি, যা তাকে বাস্তবে কিছু দেয় না, কিন্তু মানসিকভাবে সবল ক'রে রাখে। দুর্নীতি ধর্মের পক্ষে কাজ করে; দুর্নীতিপরায়ণ মানুষেরা নিজেদের অপরাধ ঢেকে রাখার জন্যে জাগিয়ে তোলে ধর্মীয় উগ্রতা। তাই সমাজে যতো দুর্নীতি বাড়ে ততো বাড়ে ধর্ম। রাজনীতিবিদেরাও ব্যবহার করে ধর্মকে; তারা দেখতে পায় ক্ষমতায় যাওয়ার সহজ উপায় ধর্মের উদ্দীপনা সৃষ্টি; তাদের কল্যাণ করতে হয় না মানুষের, বিকাশ ঘটাতে হয় না সমাজের- এগুলো কঠিন কাজ; সবচেয়ে সহজ হচ্ছে ধর্মকে ব্যবহার ক'রে ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকা। কিন্তু এতে সমাজ নষ্ট থেকে নষ্টতর হ'তে থাকে, যা এখন ঘটছে বাঙলাদেশে। রাষ্ট্রকে মুক্ত হওয়া দরকার পৌরাণিক আবেগ থেকে, কেননা পৌরাণিক আবেগ গত কয়েক সহস্রকে মানুষের কল্যাণ বিশেষ করে নি, ক্ষতিই করেছে বেশি; এবং আজো ক্ষতি ক'রে চলছে।"

আমিও হাত দেখতে পারতাম!

-মজিব রহমান

ছাত্রজীবনে হাত দেখা শিখেছিলাম। একবার এক সন্তানসম্ভবা তরুণীবধূর হাত দেখে বললাম, আপনার ছেলে হবে; তবে সাধবানে থাকবেন ফাঁড়া আছে। আপনার মেয়ে হবে এটা কখনো কাউকে বলতাম না, বিশেষ করে প্রথম সন্তান মেয়ে হবে এটা অধিকাংশেরই প্রত্যাশা থাকে না বলেই মনে হতো। তরুণীবধূর পুত্রসন্তান হয়ে মারা যায়। অর্থাৎ ঝড়ে বগ মারা গেল কিন্তু ওই পরিবারের বিশ্বাসের মাত্রাটা ছিল অনেক বেশি। আবারো সন্তানসম্ভবা হলে আমাকে বারবার তার বাসায় দাওয়াত দিতে থাকেন। আমি থাকি হলে আর ওই মহিলা থাকে সূত্রাপুর। যাওয়া কঠিনই। ওনার স্বামী কয়েকবার আসলেন আমি তালবাহানা করি। একদিন এসে ধরে নিয়ে গেলেন। আবারো হাত দেখে বললাম এবারো ছেলে হবে এবং কোন ফাঁড়া নাই, সুস্থ সন্তান হবে। কাকতালীয়ভাবে মিলে গিয়েছিল।

আমি একাধিক বইতে দেখেছি একই রেখার ভিন্ন ব্যাখ্যা, উল্টো ব্যাখ্যা। আসলে কথাচ্ছলে কিছু বিষয় জেনে নিয়ে সেই তথ্যই উপস্থাপন করা, যার হাত দেখবো তার সম্পর্কে কিছু তথ্য আগে থেকেই জেনে নেয়া এবং মানুষের চেহারা দেখেও কিছু অনুমান করেই হাত দেখা হয়। ওই মহিলার আত্মীয়া ছিল আমার সহপাঠী বান্ধবী। ওর কাছ থেকে কিছু তথ্য আগেই জেনেছিলাম।

আমিতো সৌখিন ছিলাম। কিন্তু এটাকে ব্যবসা হিসাবে নিয়ে প্রতারণা করছে অনেকে। এই সব প্রতারণার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কোন প্রচারণা নেই। তবে ভারতে রয়েছে। ভারতের যুক্তিবাদী সমিতি ঘোষণা দিয়েছিল, যদি হাত দেখে কেউ পঞ্চাশ ভাগ সত্য বলতে পারবে তবে তাকে দেয়া হবে ১০ লক্ষ টাকা (এখন সম্ভবত ৫০ লক্ষ)। তো একজন হস্তরেখাবিদ আসলেন।

১। তাকে দেয়া হয় একটি বানরের হাতের ছাপ। জ্যোতিষি বললেন, এই শিশুটি ৮০ বছর বাঁচবেন, ২৫ বছরে বিয়ে করবেন আর উচ্চ শিক্ষা লাভ করবেন।

২। এরপর তার সামনে আনা হয় একজন সফল মানুষকে যিনি দেখতে কদাকার ও রুগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী। তাকে দেখে জ্যোতিষি বলল, নিদারুণ দারিদ্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। পারিবারিক অশান্তি রয়েছে। সন্তানকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করছেন।

৩। একজন খুবই সুদর্শন দরিদ্র মানুষকে ভাল পোষাক পরিয়ে তার কাছে আনা। এবার জ্যোতিষি শুধুই সফলতার কথা বললেন।

হস্তরেখা ব্যবসা একটি প্রতারণামূলক ব্যবসা। এখন এই ব্যবসার অবস্থা পৃথিবীজুড়েই বেশি ভাল না। তবুও বাংলাদেশে জ্যোতিষসম্রাটরা প্রতারণা ফাঁদ পেতে বসে আছে। বিক্রমপুরের লিটন দেওয়ান একসময় বাসের হেল্পার ছিল এখন জ্যোতিষ সম্রাট! মূর্খ নায়ক-নায়িকা ও নেতাদের হাত দেখার ভিডিও বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অভিনেতাদের মহাজ্ঞানী ভেবে কিছু অর্বাচিনও জ্যোতিষিদের স্মরণাপন্ন হচ্ছে। লিটন দেওয়ান একজন বড় মাপের প্রতারক। দেশের বহু নায়ক-নায়িকারাই তাকে হাত দেখান। রাষ্ট্রপতি আ. হামিদসহ বহু মানুষ তাকে হাত দেখিয়েছেন। এতে সাধারণ মানুষ সহজেই প্রতারণার ফাঁদে পা দেয়। লিটন দেওয়ান বিভিন্ন রকম অপকর্ম করে এখন মুক্তিদাতার আসন গেড়ে বসেছেন।

মুঠু ভাজ করার কারণেই হাতে রেখা তৈরি হয়। এখানে ভাগ্য লেখা থাকে না। বাস্তবিক ভাগ্য বলেও কিছু নেই এবং তা হাত বা কপালসহ কোথাও লেখা থাকে না।

গল্প নয় সত্যি

-সুমন কর্মকার

আজ একটা ঘটনা শুনলাম। সাদামাটা হলেও 'রসালো' বটে। ভাবলাম আপনাদেরও শোনাই। এই বাদলা রাতে জমবে ভালো। আমাদের জেলারই আশেপাশের এক গ্রামের ঘটনা। একটা বৌ ছিল। একদম সাধারণ গ্রাম্য গৃহবধূ। বরটা কোনো এক সরকারি দফতরে চুক্তিভিত্তিক ঠিকে কেরানীগিরির কাজ করতো। শ্বশুর শাশুড়ি বিয়ের কয়েক বছর আগেই গত হয়েছিলেন। তাই স্বামী স্ত্রী আর এক ছেলে নিয়ে তিনজনের ছোট্ট সংসার। তো একদিন হল কি, বলা নেই, কওয়া নেই শ্বশুর বাড়ি থেকে সপরিবারে ফেরার পথে বৌ আর আঠেরো বছরের ছেলেকে ফেলে রেখে বরটা হঠাৎ করে স্ট্রোক হয়ে মারা গেল। হঠাৎ মানে হঠাৎই। হাসপাতাল অবধি নিয়ে যেতেও হলো না। জ্বর জ্বালা নেই, কষ্ট পাওয়া নেই, একদম শান্তির মরণ।

তো বরটা শান্তিতে পটল তুললেও বৌ আর ছেলেটা কিন্তু খুব একটা শান্তিতে থাকতে পারল না। কন্ট্র্যাকচুয়েল কাজের বেতন তো আপনারা জানেনই। রোজকার সংসার খরচ আর ছেলের পড়াশুনো চালাতেই বেশিরভাগটা বেরিয়ে যেতো। যেটুকু জমানো ছিল তাতে মাস খানেকের বেশি চালানো সম্ভব ছিলনা। তাই অন্যকোনো উপায় না দেখে বিধবা বৌটা ছেলেকে নিয়ে চলল মৃত স্বামীর অফিসে। অফিসে ঢোকামাত্রই সহানুভূতির বন্যা বয়ে গেল। 'আপনার হাজব্যান্ড দারুণ কাজের মানুষ ছিলেন', 'অমুক দাকে আমরা কক্ষণো ভুলতে পারব না' এসব আর কি। কিন্তু যেই না বৌটা বলল মৃত স্বামীর জায়গায় ছেলেকে যদি কোনোভাবে কাজে রাখা যায়, সবার ভীষণ তাড়া পড়ে গেল। 'আজ না আমার টেবিলে অনেকগুলো ফাইল পড়ে গেছে। কাজের ভীষণ চাপ। আপনি বরং অমুক বাবুর কাছে যান। উনি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করে দেবেন' বলে বাবুরা একে একে নিজেদের গা বাঁচিয়ে সটকে পড়তে লাগলেন। আপনারা আবার বাবুদের জাজ করবেন না যেন। আজকের বাজারে কেই বা এসব উটকো ঝামেলা যেচে মাথায় নিতে চায় বলুন তো? আপনি নিজেই নিতেন কি? যাই হোক, অমুকবাবু তমুকবাবুর টেবিল ঘুরে বৌটা শেষ অবধি পৌঁছালো বড়বাবুর কেবিনে। দেখা গেলো বড়বাবু মানুষটা কিন্তু এক্কেবারে অন্য ধাঁচের। পরিচয় পাওয়া মাত্র প্রাক্তন সহকর্মীর স্ত্রীকে যথোচিত খাতির করে বসালেন এবং সব শুনে একটা তারিখ দিয়ে অফিসারের সাথে দেখা করতে বললেন। উনি আগে থেকেই অফিসারকে সবটা বলে রাখবেন। নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। বৌটা একরাশ আশা নিয়ে দেবতুল্য মানুষটার মঙ্গল কামনা করতে করতে উজ্জ্বল মুখে বাড়ি ফিরে এলো। নির্দিষ্ট দিনে ছেলেকে নিয়ে অফিসারের সাথে দেখা করতেও গেল। বড়বাবু সত্যিই এক কথার মানুষ। অফিসার দেখামাত্র সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। ছেলের কাজ হয়ে গেল। মা খুশি, ছেলেও খুশি। কিন্তু বৌটার কপালে সুখ মনে হয় বেশিদিন স্থায়ী হওয়ার নয়। একদিন বিকেলবেলা, ছেলে তখনও অফিস থেকে ফেরেনি, 'দেবতুল্য' বড়বাবুর পেয়ারের আর্দালি এসে পান চিবোতে চিবোতে বৌটাকে বলল, 'বড়বাবু আজ সন্ধ্যের দিকে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। ওই সাতটা নাগাদ গেলেই হবে।' ব্যাপারটা প্রথমে বোধগম্য না হলেও আর্দালি যখন বেরোতে বেরোতে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে হেসে বলল, 'বৌদি বাপেরবাড়ি গেছেন তো তাই আর কি...' বৌটার বুঝতে কিছুই বাকি রইলো না। হতবাক হয়ে আর্দালির চলে যাওয়া দেখতে কখন যে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে গেল বুঝতেই পারল না। যথাসময়ে ছেলে ফিরে এলো। ছেলেকে খেতে দিতে দিতে বৌ টা বলল, 'বাবু, তুই বরং একটা অন্য কাজ দ্যাখ। এটা বোধহয় আর থাকবে না।' মায়ের কথা শুনে ছেলে যতোটা না আশ্চর্য হল, তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হল যখন দেখল পরেরদিনই মায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমাণ হয়ে একটা সামান্য ভুলের জন্য বড়বাবু দারুণ অপমান করে সত্যিই অফিস থেকে তাড়িয়ে দিলেন।'

কাজটা চলে যাওয়ার পর মা-ব্যাটা পড়ল অকুল পাথারে। ঘোর বর্ষাকাল। বাড়ির টালি ফেটে ঝরঝর করে জল পড়ছে। থালা বাটিগুলো পাতার সাথে সাথে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। ছেলের এই মাসের বেতন ঢুকলে মিস্ত্রী লাগানোর কথা। মিস্ত্রীকে বলাও আছে সেরকম। কিন্তু সব কেমন ভেস্তে গেল। বর্ষাটাও আগেভাগে চলে এলো, চাকরিটাও আর রইলো না। যাই হোক, সারা রাত ধরে জল বাঁচিয়ে বিছানা পত্তর এদিক ওদিক করে সকাল হতেই ত্রিপল যোগাড় করতে পঞ্চায়েত অফিস ছুটলো বৌটা। প্রধান নেই। অফিসে ঢুকে ত্রিপলের কথা বলামাত্র উপপ্রধান জানালেন 'ত্রিপল শেষ। পরের লট আসলে খোঁজ নিয়ে যাবে।' পরের লট কবে আসবে জিজ্ঞেস করাতে ব্যস্ত উপপ্রধান কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে জানালেন তার জানা নেই। অফিস থেকে বেরোতেই প্রধানের এক চ্যালা 'ও বৌদি ও বৌদি' বলে দাঁড় করিয়ে বৌটাকে আগাপাশতলা মেপে নিয়ে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলল, 'আরে, যাচ্ছেন কোথায়? আপনাদের বাড়ি তো আমি দেখেছি। আজ রাতে বৃষ্টি এলে একদম ভেসে যাবেন। ত্রিপল তো লাগবেই।' তারপর গলাটা অল্প নামিয়ে বলল, 'আসলে জানেনই তো আমাদের উপপ্রধানের এখনও বিয়ে হয়নি। ঘর সংসার নেই। রক্ত গরম। তাই

মাঝে মাঝে মেজাজটা একটু খিঁচড়ে থাকে। কিন্তু বিশ্বাস করুন একেবারে মাটির মানুষ।' চ্যালার লোলুপ চাওনিই বলে দিচ্ছিল আলোচনাটা আস্তে আস্তে কোন দিকে যাচ্ছে। এরপর ছেলেটা যখন ভুরু নাচিয়ে সরাসরি বলল, 'শুধু ত্রিপল কেন? দাদাকে খুশি করে দিতে পারলে আরও অনেককিছুই পাবেন' তখন ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। নিজের ছেলের বয়সী একজনের কাছে এহেন 'দারুণ' প্রস্তাব পেয়ে বৌটার চোখগুলো দপ করে জ্বলে উঠলো। উদভ্রান্তের মতো অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেলো ছেলেটা তখনও চিৎকার করে বলে চলেছে 'ও বৌদি রাগ করলেন নাকি? শরীর তো আর বয়স মানেনা বুঝলেন কিনা'। বৌটা বাড়ির পথ ধরলো।

গল্প হলে এটা এখানেই শেষ হয়ে যেতো। আপনারাও পটাপট হাততালি দিতেন। বলতেন এই তো চাই। একটা সৎ মানুষের আপোষহীন লড়াইয়ের গল্প। দারুণ ব্যাপার। কিন্তু আমি নিরুপায়। এটা তো গল্প নয়, ঘটনা। তাই শেষটা এভাবে হলো না। আজকের মতোই কোনো এক বৃষ্টিভেজা রাতে পাড়ার মাতব্বররা চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতে গ্রামের উপপ্রধানের বাড়ি থেকে আলুথালু বেশে বৌটাকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন। তাদের বিশেষ কিছু বলার ছিল না। কারণ পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেরিয়ে বৌটা যখন উপপ্রধানের 'ইন্টারেস্টিং' প্রস্তাবের কথা এনাদের জানিয়েছিল, এনারা ভুরু কুঁচকে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'কি জানি বাপু! গ্রামে তো তুমিই একা মেয়েমানুষ নও। তোমার চাইতে ঢের বেশি দেখতে শুনতে ভালো আরও অনেকেই আছে। কই তাদের তো কখনও এমন বলতে শুনিনি। দেখে দেখে তোমাকেই তার মনে ধরল?'

আজ বৌটার বাড়ির পাকা ছাদ। ছেলেটাও শুনলাম পঞ্চায়েতেই কি একটা কাজ করছে। দুহাতে কামাচ্ছে। আজ আর ওদের কোনো অসুবিধে নেই। কে বলে মন দিয়ে পূজো করলে 'ভগবান' সন্তুষ্ট হন না? শুধু সঠিক মন্ত্রটা জেনে নিতে হবে।

"ঈশ্বর যদি থাকতো তাহলে তারই অস্তিত্বের উপর প্রশ্নচিহ্ন লাগানো নাস্তিকদের জন্ম হতেই দিত না।"

- পেরিয়ার রামস্বামী

সর্বহারা অবিশ্বাসী

— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী, বেশ সেজেগুজে এসেছে
কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেতে বসবে না
আজ তার নীলষষ্ঠী
যৌবন বয়েসে এই নিয়ে কত না চটুল রঙ্গ করতাম
এখন শুধু একটা পাতলা হাসি,
অন্যের বিশ্বাসে নাকি আঘাত দিতে নেই
আর এক বন্ধু, যে প্রথম আমায় ছাত্র রাজনীতিতে টেনেছিল
তার আঙুলে দেখি একটা নতুন পাথর-বসানো আংটি
আমার কুঞ্চিত ভুরু দেখে সে দুর্বল গলায় বলল
শরীরটা ভালো যাচ্ছে না,
তাই শাশুড়ি এটা পরতে বললেন, মুনস্টোন
না বলা যায় না
আমার মনে হল, এ যেন আমারই নিজস্ব পরাজয়!

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের বাড়ি, মাঝে মাঝে যাই তাঁর আলাপচারী শুনতে
এখনও কত কিছু শেখার আছে
আজই প্রথম দেখলাম, তাঁর দরজায় পেছন দিকে,
গণেশের মূর্তি আটকানো
প্রশ্ন করিনি, তিনি নিজেই জানালেন,
দক্ষিণ ভারত থেকে ছেলে এনেছে, কী দারুণ কাজ না?
সুন্দর মূর্তির স্থান শো-কেসের বদলে দরজার ওপরে কেন
বলিনি সে কথা, সেই ফক্কুড়ির বয়েস আর নেই
বয়েস হয়েছে তাই হেরে যাচ্ছি, অনবরত হেরে যাচ্ছি
অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিতে নেই, অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিতে নেই
চতুর্দিকে এত বিশ্বাস, দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কত রকম বিশ্বাস
যে গেরুয়াবাদী ঠিক করেছে, পরধর্মের শিশুর রক্ত
গড়াবে মাটিতে, চাটবে কুকুরে
সেটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস
ধর্মের যে ধ্বজাধারী মনে করে, মেয়েরা গান গাইলে গলার নলি
কেটে দেওয়া হবে
টেনিস খেলতে চাইলেও পরতে হবে বোরখা
সেটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস
যে পেটে বোমা বেঁধে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে
যে পেশি ফুলিয়ে, দেঁতো হাসি হেসে
পদানত করতে চাইছে গোটা বিশ্বকে
এরা সবাই তো বিশ্বাসীর দল
সবাই বিশ্বাসী, বিশ্বাসী, বিশ্বাসী...

এক একবার ভাঙা গলায় বলতে ইচ্ছে করে
অবিশ্বাসীর দল জাগো
দুনিয়ার সর্বহারা অবিশ্বাসীরা এক হও!

অনুগল্প - ২

-জামাল আনসারী

বাইকটি খারাপ।তাই সাইকেল চালিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি।

—স্যার! ও স্যার!

পিছন ফিরে দেখি, সুস্মিতা।আমার স্কুলের ছাত্রী।লকডাউনের আগে ক্লাস এইটে পড়ত।তারপর দুই বছর স্কুল বন্ধ! পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসে প্রথম স্থানটি একমাত্র সেই দখল করে রাখত।খুবই মেধাবী ছাত্রী। একদিন পড়াশুনার ফাঁকে টিফিনের সময় ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীদের জানতে চেয়েছিলাম, পড়াশুনা করে, বড় হয়ে তোমরা কে কি হতে চাও? সুস্মিতা বলেছিল—সে ডক্টর হতে চায়।

—আচ্ছা, বলো দেখি সুস্মিতা, তুমি কেন ডক্টর হতে চাও!

—স্যার, ডক্টর হলে মানুষের সেবা করতে পারব।আমাদের জেলায় কত গরিব মানুষ আছে, যারা টাকার অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারে না। আমি তাদের বিনে পয়সায় চিকিৎসা করব।

—বাহ! খুব ভালো। আগে ভালো করে মনযোগ দিয়ে পড়াশুনা করো। একদিন ঠিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

আমি সাইকেলটি থেকে নামতেই সুস্মিতা কাছে এসে বলল, স্যার, ভালো আছেন?

—হ্যাঁ! ভালো আছি। কিন্তু তোমার মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা! তোমার কি এই লকডাউনে বিয়ে হয়ে গেল?

সে আর কিছু বলেনি।চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যাগাজিনের জন্য লেখা ও মতামত জানান এই ঠিকানায় yuktibadira@gmail.com ধন্যবাদ।

-যুক্তির পথে আমরা-

-যুক্তিবাদীরা-